আনন্দমেলা

১ জুলাই ১৯৮৭ • আনন্দবাজার-প্রকাশনা • ২৲

স্বাস্থ্য ঝলমল,
প্রাণে খুশী উচ্ছল
SPECIAL REFILL PACK
Save Re.1/-
Cadbury's
Bournvita
The tastier food drink
500 g net
Cadbury's
Bournvita
The tastier food drink
OBM 6617 BN
মজাদার বোর্নভিটা আপনার পরিবারকেও দিন।
স্বাদেভরা বোর্নভিটা, কোকো, মল্ট, দুধ আর
চিনির গুণে ভরপুর।
এবার ! বড়রকম সঞ্চয়, পুরো এক টাকার
রিফিল প্যাকের সঙ্গে
ক্যাডবেরিস
আপনাদের জন্যে

আনন্দমেলা

১৬ আষাঢ় ১৩৮৮ • ১ জুলাই ১৯৮১ • ৭ বর্ষ • ৬ সংখ্যা

বিশেষ রচনা

টেলিভিশন । আশিস দেব রায় ৪

উপন্যাস

হারানো কাকাতুয়া । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৫
সিসের আঙটি । বিমল কর ৫৬

ছড়া

তিন রকম । সুশীল রায় ২৭
কাশীদার ফাঁসি । রঞ্জন ভাদুড়ী ৩৬
গল্পের গোরু । শ্যামলকান্তি দাশ ৪৭

গল্প

সুন্দরবনের চড়ায় । নিখিলচন্দ্র সরকার ১০
মিঠুয়ার বন্ধু । দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২২
ভোরের অ্যালার্ম । সাধনা মুখোপাধ্যায় ৪৮
রক্তের টান । বাণীব্রত চক্রবর্তী ৫৩

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ১৮

খেলোয়াড়ের আত্মকথা

উইং থেকে গোল । পি কে ২৪

লেখাপড়া

বাংলা বলো । বাচস্পতি ৬২
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৬৩

খেলাধুলো

মোহনবাগানের কোচ । রঞ্জিতকুমার ঘোষ ৪২
বাঁ-হাতি একাদশ । অশোক রায় ৪৪

চিত্রকাহিনী ও কমিক্‌স

সদাশিব ২৮, রোভার্সের রয় ৩০, টিনটিন ৩২
টারজান ৬০, গাবলু ৬১, ৬৫, বাঘা ৬৪

অন্যান্য আকর্ষণ

ছবির মজা ২১, ধাঁধা-মজা-রহস্য ৩৪
তোমাদের পাতা ৩৯, আঁকো-শেখো ৬৬
উলাগানাথনের পুরোপাতা রঙিন ফোটো ৪১

প্রচ্ছদ : জ্যোতি বকশী

সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম : দু'টাকা

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ৫ পয়সা। পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

এক্ষুনি লাগান বার্নল—
পুড়ে যাওয়া জখমের
আসল চিকিৎসা!

পোড়ার জখমের সঙ্গে অন্যান্য জখমের অনেক তফাৎ। পুড়ে যাওয়ার জ্বালা তীব্র যন্ত্রণাদায়ক। আর পোড়া থেকে ফোস্‌কাও পড়ে। এর জন্যে আপনার দরকার পোড়ার জখমের আসল চিকিৎসা—বার্নল অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীম। বার্নল নিমেষে জ্বালা উপশম করে, স্নিগ্ধ করে আর ফোস্‌কাও পড়তে দেয় না। পোড়ার জখম শীঘ্র উপশম করার সব ক'টি উপাদানই বার্নলে রয়েছে।

সবসময়ে ঘরেতে রাখুন বার্নল।

বার্নল

পুড়ে যাওয়া জখমের আসল চিকিৎসা।

11TH-BCL-5641

টেলিভিশন

আশিস দেবরায়

যে-সব শহরে টেলিভিশন বা দূরদর্শন আছে, সেখানকার বা তার আশপাশের লোকেরা বাড়িতে বসেই শহরে দেখার-মতো যা-কিছু হচ্ছে, তা দেখে নিচ্ছে। টেলিভিশন যেন সমস্ত শহরকে বাড়ির দোরগোড়ায় এনে দিয়েছে। শুধু কি তাই? বিশাল এই দেশের না-চেনা কত দৃশ্য, পশুপাখি ও মানুষের কত বিচিত্র জীবনযাপন আমরা টেলিভিশনের পর্দায় প্রায়ই দেখতে পাই। তবে শহরের বাইরের যে-ছবি আমরা দেখি, তার বেশির ভাগই আগে ক্যামেরায় তুলে পরে টেলিভিশনের পর্দায় মেলে দেওয়া হয়। বিদেশে কিন্তু অনেক শহরে রিলে অথবা স্যাটেলাইট প্রথায় অন্যান্য শহরের বা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে বিশেষ ঘটনা **ঘটছে,** সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে দেখিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই যেমন, ২৯ জুলাই লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত সেনট পল্‌স ক্যাথিড্রেলে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ চার্লসের সঙ্গে লেডি ডায়নার স্পেনসারের যে বিয়ে হবে, তার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান সাত ঘণ্টা ধরে সারা পৃথিবীর অন্তত ৫০ লক্ষ লোক সরাসরি বি বি সি টেলিভিশনে দেখতে পাবে। ব্যাপারটা কিন্তু খুব সহজ নয়। এই অনুষ্ঠান **দেখাতে** বি বি সি টেলিভিশনকে ৬০টি ক্যামেরা, ১২টি ভ্রাম্যমাণ **কনট্রোলরুম** ও প্রায় ৩০০ **কর্মী** নিয়োগ করতে হবে। ঠিক একইভাবে ইউরোপের বা আমেরিকার অনেক বড় শহরে রোববার তো বটেই, অন্যবারেও বিভিন্ন **চ্যানেলে** নানারকমের খেলা সরাসরি মাঠ থেকে দেখানো হয়।এমনও দেখা যায় যে, অন্যান্য চ্যানেল ব্যস্ত থাকায় একই চ্যানেল থেকে একই সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খেলার—যেমন ক্রিকেট, অ্যাথলেটিকস্, মল্লযুদ্ধ, মোটর-রেস ইত্যাদির বিশেষ অংশ **কনট্রোলরুম** থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দর্শকদের দেখানো হচ্ছে। এইভাবে বিভিন্ন খেলার উত্তেজক কিছু কিছু অংশ একই দিনে ঘরে বসে যে দেখা সম্ভব, তা ভাবতে আমাদের আজও অবাক লাগে, তাই না?

পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সবচাইতে বড় টেলিভিশন কেন্দ্র হল লণ্ডনের বি বি সি। রেডিওতে লণ্ডন বি বি সি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস তো আমরা সব সময়েই শুনতে পাই। সেখানকার ৫২টি স্টুডিও থেকে পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। এর মধ্যে ভারতীয় উর্দু হিন্দি বাংলা তামিল (সপ্তাহে ৪ দিন) ও নেপালি (সপ্তাহে ৩ দিন) ভাষাও আছে। কিন্তু বি বি সি টেলিভিশনের ঐ অত্যাশ্চর্য অনুষ্ঠানগুলো দেখতে হলে আমাদের তো

নাচের অনুষ্ঠান, বি বি সি

যেতে হবে সেই লণ্ডন।

লণ্ডন টেলিভিশনের বি বি সি-১ বি বি সি-২ ইত্যাদি চ্যানেলগুলো অনেকটা কলকাতা আকাশবাণীর ক ও খ-এর মতো, অর্থাৎ চ্যানেল ঘোরালেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখা যায়। লণ্ডনের **শেপার্ড** বুশের বিরাট ৮টি স্টুডিও দ্বারা নির্মিত **টেলিভিশন-কেন্দ্র** থেকে এই অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। টেলিভিশনের বাৎসরিক লাইসেন্স ফী বাবদ সাধারণ লোকের কাছ থেকে যে-টাকা আদায় হয়, তাতেই এদের সব

খরচ চলে যায়। টেলিভিশনের অন্য চ্যানেল **আই** টি ভি-তে চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। বিরাট স্টুডিও ছাড়াও বি বি সি টেলিভিশনে সাজসজ্জার ঘর, প্রসাধনের ঘর, কলাশিল্পের ঘর প্রভৃতি দেখার মতো।

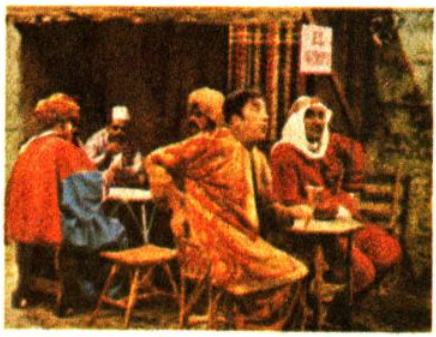

তোমাদের মতো যারা ছোট, তাদের জন্য বি বি সি টেলিভিশন এত সুন্দর ও মজাদার অনুষ্ঠান করে যে, না-দেখলে বোঝা যায় না। দুপুর বারোটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বি বি সি টেলিভিশনের অনুষ্ঠানপ্রচারের যে-সময় ধার্য করা আছে, তার মধ্যে দুপুর ও বিকেলের দিকে ছোটদের বহু অনুষ্ঠান দেখানো হয়। যেমন অ্যাডভেঞ্চার জাতীয় ফিল্ম, আজব বৈজ্ঞানিক ফ্যান্টাসি, কৌতুক রচনা (যেমন, লণ্ডনের বাসে বসে লেডি **কণ্ডাক্টর** কী করে টিকিট বিক্রি করে), মূকাভিনয়—আরো কত **কী** দেখানো হয়। ক্রিকেট, টেনিস, ঘোড়দৌড়, মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি নানাধরনের খেলাধুলোও এর মধ্যে থাকে। লণ্ডনে ফুটবলের মান খুব উঁচু।

বি বি সি স্টুডিয়োতে লঘু অনুষ্ঠানের মহড়া চলছে

Audion Boosters – An Extra Boost for your Bharat TV

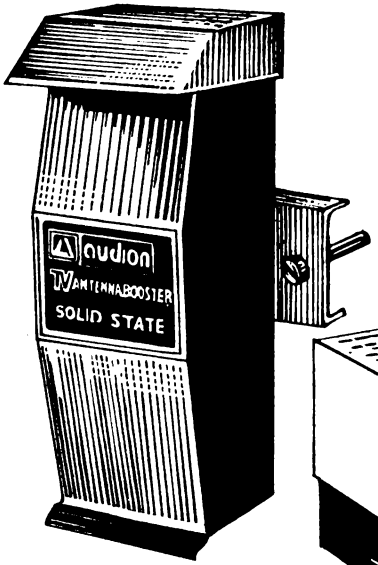

- ★ High-Technology & Engineering Excellence
- ★ Increases Reception range. Allows users to receive Bangladesh programmes.
- ★ Always gives a sharp, clear picture and smooth, disturbance free sound.

Always specify Audion TV antenna Boosters — they're real boosters!

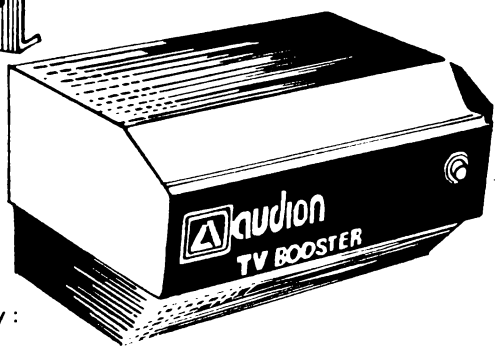

Manufactured by :

audion

34 Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta 700 020. 47-8084

Dealer : SUKANTA, 56 Chowringhee, Calcutta 700 071. 44-0254/43-1976

adsystems-81

ওয়েম্বলি স্টেডিয়াম বা অন্য কোথাও তেমন কোনো ফুটবল খেলা হলে তা-ও টেলিভিশনে দেখানো হয়। কর্নার কিক থেকে বল বেঁকে গোলে ঢুকে যাওয়া, দুরূহ কোণ থেকে হেড করে গোল দেওয়া, বহুদূর থেকে কোনাকুনি তীব্র শটে গোল দেওয়া বা পেনালটি শট গোলকীপারের বাঁচিয়ে দেওয়া—এ-সব প্রায়ই টেলিভিশনে দেখানো হয়। স্লো মোশানে দেখানো হয় বলে আরও ভাল লাগে। কলকাতা দূরদর্শন-কেন্দ্রে তোমরা নিশ্চয়ই 'ফাদার, ডিয়ার ফাদার', 'অ্যারাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ','দি অ্যাসেন্ট অব ম্যান', শেক্সপীয়রের নাটক ইত্যাদি দেখেছ—এ-সবই বি বি সি টেলিভিশনের তৈরি অনুষ্ঠান। এ ছাড়া টেলিভিশনে প্রতিদিন দুপুরে নির্দিষ্ট সময়ে নানান শিক্ষামূলক বিষয়—যেমন পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, গণিত, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কিত অনুষ্ঠান পরিবেশন করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা হয়। ক্লাসে বিষয়টি কেউ ভাল রকম না বুঝলেও টেলিভিশনের পর্দায় ছবির মাধ্যমে বিষয়টি সহজ হয়ে ওঠে। আমরা জানি, মনের উপর রেখাপাত করার ক্ষমতা ছবির অপরিসীম। তোমরা যারা কলকাতা দূরদর্শনে ছোটদের অনুষ্ঠান দেখতে ভালবাসো, তারা প্রায়দিনই সন্ধেবেলা পড়াশুনোর জন্য হয়তো ঠিকমতো দেখতে পারো না। কিন্তু ওখানকার ছেলেমেয়েদের সন্ধেবেলা পড়াশুনোর কথা ভেবেই দুপুরে ও বিকেলে অনুষ্ঠানগুলো দেখানো হয় তাদের। আর ঠিক সাতটা-আটটায় বড়দের জন্য নানা অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সে-সব অনুষ্ঠানের খবরাখবর তোমাদের শুনতে ভাল না-ও লাগতে পারে। তবে এটুকু জানা প্রয়োজন যে, বি বি সি টেলিভিশন রোববার সকালে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শ্রোতাদের জন্য আধঘণ্টার এক বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। আর-একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, বি বি সি টেলিভিশনের সংবাদ পরিবেশনের ধরনটি সত্যিই চোখে লেগে থাকে। লণ্ডনের কাছে কোনো শহরে বা অনেক সময় অন্য দেশে—যেমন, ফ্রান্স বা পশ্চিম জার্মানিতে—সকালে ঘটা কোনো ঘটনার ছবি

কলকাতা টিভিতে শিশুদের অনুষ্ঠান

সেদিন বিকেলেই বি বি সি টেলিভিশনের খবরে পরিবেশন করা হয়। আমাদের দেশের নানান জায়গার উৎসব বা কোনো বিপর্যয়ের ঘটনা হয়তো কলকাতা টেলিভিশনে সেদিনই দেখানো সম্ভব হয় না, অথচ বি বি সি টেলিভিশনের প্রতিনিধিরা কিন্তু সেদিনের ঘটনা সেদিনই ক্যামেরায় ধরে লণ্ডনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন বিকেলের খবরে দেওয়ার জন্য।

ইউরোপের সব দেশেই এত শীত যে, লোকে বাড়িতে বসে টেলিভিশনের নানা অনুষ্ঠানের সামনে থেকে আর নড়ে না। শুনলে অবাক হবে, পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর (আমাদের রাষ্ট্রপতির সমতুল্য) কিছুদিন আগে দেশবাসীকে সপ্তাহে একদিন টেলিভিশন বন্ধ রেখে বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে আহবান জানিয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ড বলো আর ইউরোপের অন্য কোনো দেশের কথাই বলো, সব জায়গাতেই কিন্তু রাত বারোটা পর্যন্ত টেলিভিশনের বিচিত্র অনুষ্ঠানগুলো দেখে ভোরবেলা ঠিক সময়ে কাজে যাওয়া প্রায় মুশকিল হয়ে পড়ে।

এতক্ষণ তো বিদেশের কথা হল। এবার একটু দেশের কথায় আসা যাক। নিজের দেশের কথা না-জানলে তো অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করে ভাল মন্দ বিচার করা যায় না। কলকাতা দূরদর্শন-কেন্দ্রের অনেক অনুষ্ঠানই—বিশেষত ছোটদের অনুষ্ঠানগুলো বেশ ভাল। যেমন 'চিচিং ফাঁক', 'হরেকরকম্বা', 'মাইকেলের আসর', 'জানা অজানা'—তোমাদের পরিবেশিত এসব অনুষ্ঠান আমাদেরও বেশ ভাল লাগে। তবে কলকাতা দূরদর্শনের মাত্র একটা স্টুডিও থাকায় দৈনিক তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠানসূচীর মধ্যে তোমাদের জন্য বেশি সময় দেওয়া সম্ভব হয় না।

কলকাতা ছাড়াও এদেশে দূরদর্শন-কেন্দ্র রয়েছে দিল্লি, শ্রীনগর, লখ্‌নৌ, বোম্বে, পুনে, মাদ্রাজ, সম্বলপুর, জয়পুর, মজঃফরপুর ও রায়পুরে। আগামী বছর আমেদাবাদ, বাঙ্গালোর ও ত্রিবান্দ্রামে নতুন দূরদর্শন-কেন্দ্র খোলার কথা। বোম্বে, দিল্লি, শ্রীনগর ও মাদ্রাজ কেন্দ্রে নিয়মিত অনুষ্ঠান দেখানো ছাড়াও রোববার সকালে বিশেষ অনুষ্ঠান ও সপ্তাহে কয়েকদিন দুপুরে শিক্ষা বিষয়ে অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। কলকাতা দূরদর্শন নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হলে অনুষ্ঠানসূচী আরও বাড়বে বলে আশা করা যায়। সুতরাং তোমাদের জন্য আরও চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান হয়তো তখন সংযোজিত হবে। আর-একটা সুখবরও তোমরা নিশ্চয়ই জানো—কলকাতা দূরদর্শনের পর্দায় কয়েকদিন পরে হয়তো আমরা রঙিন ছবি দেখতে পাব। এবারে শোনো, আগামী বছর আসানসোল ও মুর্শিদাবাদে কলকাতা দূরদর্শনের 'রিলে সেণ্টার' বসানোর কথা। এমনি করে কলকাতা দূরদর্শন গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে পড়লে তো ভালই হয়। এতক্ষণ দেশবিদেশের টিভি সম্পর্কে তো বললাম।

(উপরে) মেক-আপের পর, (নীচে) মেক-আপের ঘর

কিন্তু কী করে এতসব ঘটনা বা অনুষ্ঠান দূরদর্শন-কেন্দ্র থেকে বাড়ির টেলিভিশনের পর্দায় আসে সেটা কখনো ভেবে দেখেছ কি?

বেয়ার্ড নামে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী টেলিভিশনের আবিষ্কর্তা। টেলিভিশনে প্রচারিত যে-অনুষ্ঠান প্রেরকযন্ত্র বা ট্রান্সমিটার চারদিকে প্রেরণ করে, বাড়িতে রাখা টেলিভিশন সেট তাকে এরিয়াল বা অ্যান্টেনার সাহায্যে গ্রহণ করে। অভ্রনির্মিত পাতলা গোল প্লেট দিয়ে প্রেরকযন্ত্রে এক মোজায়েক পর্দা তৈরি করা হয়। প্লেটের একপিঠে খুবই ছোট ছোট হাজার হাজার রুপোর দানা গাঁথা থাকে এবং তার উপর সেলেনিয়াম ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। এখন এই সেলেনিয়াম ধাতুর উপর আলোকরশ্মি ফেললে তা থেকে আরও বেশিমাত্রায় ইলেকট্রন বিচ্ছুরিত হয়। টাংস্টেন বা প্লাটিনাম ফিলামেন্ট দিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তা উত্তপ্ত হয়, যার ফলে ইলেকট্রন ধাতু থেকে ছিটকে বেরোয়। এই ইলেকট্রন প্রক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে একত্র হয়ে পাতলা ও ঘন রেখার আকারে দ্রুত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং ক্রমশ এক বিদ্যুৎক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এর প্রভাবে ইলেকট্রন প্রতি সেকেণ্ডে দশ হাজার বার ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নীচে দুলতে থাকে। ট্রান্সমিটার এই ইলেকট্রনকে বাইরে সঞ্চারিত হওয়ার জন্য প্রেরণ করে এবং অ্যান্টেনা এই বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গমালাকে ধরে টেলিভিশন সেটে পাঠায়। পর্দার গায়ে যেখানে অধিকমাত্রায় ইলেকট্রন পড়ে সেখানে বেশিমাত্রায় আলো হয়, আর যেখানে কম পড়ে সেখানে আবছা ছবি দেখা যায়। যে-কোনো দৃশ্যকে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রসারিত করার আগে পরিলেখন করার প্রয়োজন হয়, ফলে যে-কোনো মাপের দৃশ্যকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে প্রেরণ করা হয়, অথচ টেলিভিশনে সেটাকে স্বাভাবিক দৃশ্য হিসাবে দেখা যায়। গদার মতো দেখতে ইকনোস্‌কপ যন্ত্র দূরদর্শন-কেন্দ্রে প্রচারিত দৃশ্যকে সঞ্চারিত করে। এই একই আকৃতির কিনোস্‌কপ গ্রাহক যন্ত্র সেই দৃশ্যকে গ্রহণ করে টেলিভিশনের পর্দার গায়ে তাকে ফুটিয়ে তোলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এসব পদ্ধতি ক্রমে আরও উন্নত ও জটিল হচ্ছে।

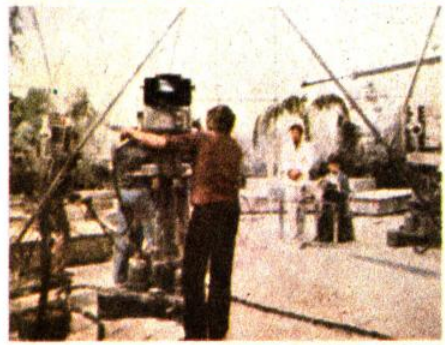

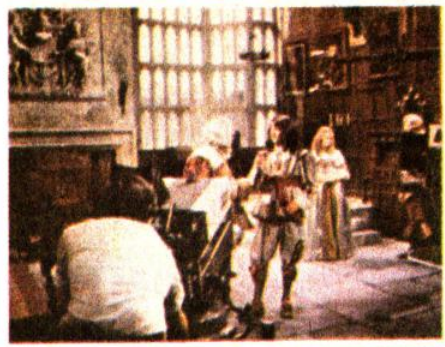

বি বি সি স্টুডিয়োতে নাটকের মহড়া

সুন্দরবনের চড়ায়

নিখিলচন্দ্র সরকার

কনকবাবুদের লঞ্চটা সবে মালসাভাঙ্গি নদীতে পড়েছে, আর ঠিক তক্ষুনি সোনার থালার মতন সূর্যটা টুপুস করে নদীর জলে ডবে গেল। সোনালি রঙ তখনো আকাশের গাঁয়ে লেগে থাকল। সেই রঙ ছিটকে এসে পড়ল জলের বুকে। ঢেউয়ের মাথায় দোল খেতে খেতে এক সময় তা ধূসর হল। এমনি করেই আঁধার নামল নদীর বুকে। মালসাভাঙ্গি থেকে তারা গিয়ে পড়বে গুমর নদীতে। আরো অনেকটা এগিয়ে ডান দিকে দুর্গাদুয়ানি খাল ধরে গোসাবা। গোসাবা থেকে করতাল নদী ধরে হোগলডরি, পুরন্দরের মুখ হয়ে মাতলা নদী। মাতলা ধরে ক্যানিং। আজ কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। কনকবাবুরা বিকেল-বিকেলেই গোসাবা চলে আসতেন। কিন্তু সারেঙের ভুলের জন্যে ওঁরা ঘণ্টা-আড়াই চক্কর খেলেন।

সবাই তখন নানারকম গপ্পগুজবে মশগুল। হঠাৎ লঞ্চটা বেশ জোরে দুলে উঠল। ঘ্যাটাং ঘ্যাট, ঘ্যাটাং ঘ্যাট, টিং, টিং টিং। সবাই চমকে উঠল। লঞ্চ তো চলছে না! সর্বনাশ! চড়ায় আটকে গেছে। অন্ধকারে বুড়ো সারেঙ ঠিক বুঝতে পারেনি। আবার টিং টিং করে ঘন্টি বাজে। মেশিন ঘরে ঘ্যাটাং ঘ্যাটাং শব্দ ওঠে। সারেঙ তখন পাগলের মতন স্টিয়ারিং ডাইনে বাঁয়ে করছে। বালি কেটে কেটে যেন আরো বসে যাচ্ছে লঞ্চটা। কনকবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে, সর্বনাশ হয়ে যাবে যে, এই জোরজুলুম করতে গিয়ে শেষে প্রপেলারটা একবার ভেঙে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। তখন সবাই ডবব।" সারেঙের আর সাহস হল না। মেশিন বন্ধ।

বড়-ছোট, বউ ছেলে-মেয়ে, ঠাকুর-চাকর নিয়ে জনা চল্লিশের মতন লোক লঞ্চটায়। ভয়ে সবারই মুখ তখন একেবারে ছাই। বাপ্পাদার বাবা সোমনাথবাবুই বেশি ভয় পেয়েছেন। তাঁর গলা শুকিয়ে আঠা-আঠা। বারকয়েক ঢোক গিলে তিনি বললেন, "এখন উপায়?"

প্রশ্নটা সবার মনেই পাক খেয়ে গেল। প্রায় সবারই মুখ ফ্যাকাসে। নদীর মধ্যিখানে এভাবে যে আটকে পড়বে, এটা ঘুণাক্ষরেও কারো মনে হয়নি। কার মুখ দেখে যে আজ সকাল হয়েছিল! রাগ বিরক্তি ভয় সব মিলিয়ে মনের এক গুমোট অবস্থা। কনকবাবু যেন কী ভাবছেন, ভাবতে ভাবতে বললেন, "জোয়ার না আসা অব্দি এখানেই আমাদের পড়ে থাকতে হবে।"

"কখন জোয়ার আসবে?" কেয়ার মার গলায় উৎকণ্ঠা। উৎকণ্ঠা আরো অনেকের চোখেই ঝিলিক মারল। অনেকেই কনকবাবুর

মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

কনকবাবুও চিন্তিত। মুখের ওপর মেঘলা দিনের ছায়া। বললেন, "সকাল ন'টায় জোয়ার এসেছিল, আবার সেই রাত ন'টায় জোয়ার।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি দেখলেন সোমনাথবাবু, "এখন তো সবে সাতটা!"

"ওমা, আরো দু ঘণ্টা?" পুপু তো ভয়ে কেঁদেই ফেলল। মাকে জড়িয়ে ধরল। আরো অনেকেরই তখন প্রায় কাঁদো-কাঁদো অবস্থা।

কনকবাবু অস্ফুটে শুধু বললেন, "কোনো উপায় নেই।"

বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশে তারা মিটমিট করছে। জলের সোঁ-সোঁ শব্দ। জঙ্গলের দিক থেকে হুহু করে বাতাস ছুটে আসছে। এলোমেলো, চটকা বাতাস। তাকালেই গায়ে কাঁটা দেয়। বুক ঢিপঢিপ করে।

এখন কারো মুখে আর কথা ফুটছে না। বেশ হৈ হৈ করতে করতে ওরা আসছিল। কত গান, গল্প আর হাসাহাসি। হালকা ফুরফুরে মেজাজ। বেড়ানোর মজায় সবাই মেতে উঠেছিল। শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। গেঁমা হেঁতাল বাইনগাছের সারি। মাঝে মাঝে ধুঁদুল। সজনেখালি টাওয়ারের ওখানে একটা কুমির চোখে পড়েছিল। কী উল্লাস! চিৎকার। হাততালি। হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সব্বাই। দু চোখ ভরে দেখে দেখেও আর আশ মেটে না। এ তো আর চিড়িয়াখানায় কুমির দেখা নয়, একেবারে সুন্দরবনের জঙ্গলে, নদীর চড়ায়! সারাদিন সেই গল্পই চলল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। একটা বাঘ চোখে পড়লেই, ব্যাস, তাদের আর আফসোস থাকত না। কিন্তু কোথায় বাঘ! কপালে না থাকলে বাঘ চোখে পড়ে না। সুন্দরবনের বাঘ তো আরো চালাক। এসব জায়গা নদী খাল আর খাঁড়িতে ভরতি। অজস্র ঝোরা। গা ছমছম করে। বনের মধ্যে হিসহিস শব্দ। মৌলীরা মধুর লোভে ভেতরে ঢোকে। জেলেরা সীসখালের ভেতরে মাছ কুড়োতে যায়। কারো কারো আবার কাঠ চুরির নেশা। বনের দেবী বনবিবির দোহাই পাড়ে তারা। তবু কেউ কেউ আর ঘরে ফেরে না। এমনি সব নানান গল্প।

এই রেশটাই হঠাৎ থমকে গেল। সব কেমন চুপসে গেছে। সবাই যেন আচমকা নিজের নিজের মধ্যে ডুবে গেল। কথা থেমে গেল। একটা ভয়, আতঙ্ক যেন নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। নাঃ, এ এক দমফাটা অবস্থা। হঠাৎ কনকবাবু বললেন, "কী, এত চুপচাপ কেন, মাত্র তো দু ঘণ্টা, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এই কেয়া, একটা গান কর।"

সকলে আবার নড়েচড়ে বসল। বুড়ো সারেঙ কী একটা কাজে তখন মেশিন ঘরে এসেছে। সে হঠাৎ ওদের মুখের দিকে তাকাল। একটু চুপ করে থেকে বলল, "বাবু, আপনারা বেশি জোরে কথা বলবেন না।"

অনেকেই চমকে উঠল ওর কথায়, "কেন?"

বুড়ো সারেঙের মুখও ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে। চোখের তলায় কী এক রহস্য উঁকি মারছে। একটু চুপ করে থেকে নিচু গলায় ও বলল,

গত বছরে
কী দিয়ে
সব ধরনের কাপড়
ঘরেতেই ধুয়ে আমি
১০০/- টাকা বাঁচিয়ে
ফেলেছি !

কী
অন্যান্য নামী
ডিটারজেন্টের
চেয়ে
দামে ৩০% কম !

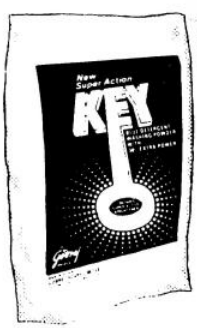

দারুণ কার্যকরী কী গরম, ঠাণ্ডা — দু'রকম জলেতেই চটপট গুলে গিয়ে রাশি রাশি ফেনা তৈরী করে, যা কাপড়ের সব ময়লা নিংড়ে ঘুরে কাপড় চমৎকার পরিষ্কার করে ফেলে।

দারুণ সাদা করার ক্ষমতাসম্পন্ন কী আপনার কাপড়কে করে তোলে ধবধবে সাদা, ঝলমলে উজ্জ্বল। কারণ, এর মধ্যে রয়েছে কাপড় দারুণ সাদা ও উজ্জ্বল করার বিশেষ এক কার্যকরী উপাদান।

দারুণ সাশ্রয়কর কী পাওয়া যায় ৪০ গ্রাম, ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কিলো ও ২ কিলোগ্রামের প্যাকে।

দারুণ-কার্যকরী।
দারুণ-সাদা করার শক্তি।
দারুণ-সাশ্রয়কর।

কী
দ্য ডিটারজেন্ট
পাউডার

গোদরেজ-এর
উৎপাদন

CHAITRA-G-137 BEN

"জায়গাটা খুব ভাল নয়, কাছেই জঙ্গল।"

"কেন, কী হবে?" সোমনাথবাবুর গলাটা চিড় খেল। চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। মুখের রঙ পাণ্ডুর।

বুড়ো সারেঙের গলায় রহস্য আরো ঘন হয়, বলে, "হলে তো অনেক কিছুই হতে পারে বাবু।"

কারো মুখে কথা নেই। বুকের মধ্যে ঢিপিস ঢিপিস শব্দ। বলে কী সারেঙ! তারা চুপচাপ আকাশ-পাতাল কত কী ভাবল। কিছুই বুঝতে পারল না। বুড়ো সারেঙ অভিজ্ঞ মানুষ। জল-জঙ্গলের মেজাজমর্জি সবই ওর জানা। ওরা বুড়ো সারেঙের মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। মুখের ওপর ভয়ের ছায়া। সারেঙ যেন কী ভাবছিল। একটু পরে ধীরে ধীরে ও বলল, "জলের বিপদ কি এক রকমের বাবু, অনেক।"

বাপ্পা পুপু কেয়া ওরা হাঁ করে সব শুনছে। শুনছে আরো অনেকেই।

কনকবাবু উসখুস করলেন। ভয়টা যেন তখনো এই লঞ্চের খোলের মধ্যে নিঃশব্দে ঘুরঘুর করছে। তিনি সারেঙের দিকে চেয়ে বললেন, "আর ঘণ্টা দেড়-দুয়ের মধ্যে তো চাঁদ উঠে যাবে।"

হিমাংশুবাবুর কাছেও এই ভয়-ভয় নীরবতা আর ভাল লাগছিল না। অস্বস্তি তাড়াবার জন্যে তিনি পকেট থেকে সুপুরির কুচি তুলে নিয়ে মুখে ফেললেন। বললেন, "কেন, বাঘ-টাঘ এসে লাফিয়ে পড়বে নাকি?"

বুড়ো সারেঙের মুখে ভয় ফুটল। মুখের রঙ ছাই। মরা মাছের চোখের মতন। ভয়ার্ত গলায় সারেঙ বলল, "উঁহু উঁহু, এসব কথা মুখেও আনবেন না বাবু। এ সবই হল গিয়ে বনবিবির তল্লাট। বনবিবির একবার কোপ পড়লে.....দোহাই বনবিবি, দোহাই মা।" বুড়ো হাত ঠেকাল কপালে।

বাপ্পা ওই অন্ধকারের ভেতর দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক্ষণ থেকেই ওর মগজের মধ্যে একটা ডোরাকাটা বাঘ ঘোরাঘুরি করছে। একটু পরে ও চিৎকার করে উঠল, "বাঘ, বাঘ।"

সবাই লাফিয়ে উঠল। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস। মেয়েরা বাচ্চারা কেউ কেউ হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল।

কোথায়, কোথায় বাঘ?" সবারই চোখ তখন জলের ওপর। অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না।

বুড়ো সারেঙের চোখ বড় বড় হয়ে উঠেছে। মুখ গম্ভীর। একটু পরে বুড়ো বলল, "খোকাবাবু ভয় পেয়েছে। ওরা এভাবে আসে না বাবু, এলে টের ও পাবেন না।"

"এখানে ওরা কী করে আসবে?" হিমাংশুবাবুর কাছে এ যেন একটা ধাঁধা।

বুড়োর চোখে রহস্য। একটু চুপ করে থেকে ও বলল, "এসব নদী খাল ওরা সহজেই সাঁতরে চলে আসে। হ্যাঁ বাবু, এই তো ক'মাস আগের ঘটনা। ঝাড়খালির পরান কামিলা আর তার বেটা মাছ ধরতে গিয়েছিল বনের ভেতরে। মাঝগাঙে নৌকা নোঙর করে ওরা মনের সুখে ঘুমোচ্ছিল। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে পরান দেখল, ছেলে নেই। নেই তো নেই-ই। কত ডাকাডাকি। বুঝল, ও আর কোনোদিনই ফিরবে না। এরকম চুপিসারেই ওরা কাজ হাসিল করে।"

"তাহলে এখানেও তো আসতে পারে?" সোমনাথবাবুর গলা কেঁপে গেল।

"হ্যাঁ পারে, তবে লঞ্চে ওরা ঠিক কায়দা করতে পারে না।"

যাক বাঘের ভয়টা তাহলে কাটল। একটু হাসি ফুটল মুখে। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কনকবাবু বললেন, "এমনও তো হতে পারে সারেঙ, জোয়ার এল অথচ লঞ্চটা আর ভাসলই না। বালিতে আটকেই থাকল?"

"হ্যাঁ, হতেই পারে।" বুড়ো নির্বিকার।

"তাহলে?" আবার সেই ভয়।

"তাহলে আর কী হবে, হয় কুমিরে খাবে, না-হয় কামটে কাটবে।" কনকবাবু বললেন।

এমন সময় জলের বুকে হঠাৎ ছপাত ছপাত শব্দ শুনতে পেল সারেঙ। কান খাড়া করে রাখল। শব্দটা এদিকেই যেন আসছে। কারা যেন ফিসফিস করছে। বাতাসে টুকরো টুকরো কথা। খুবই অস্পষ্ট। সারেঙ ইশারা করে চলল, "চুপ চুপ বাবু, আরও একটাও কথা নয়।"

সবাই ওর মুখের চেহারা দেখে ভয় পেয়ে গেল। বুড়ো সারেঙ ঝট করে আলো নিবিয়ে দিল। টুঁ শব্দও নেই। ভয়ে ভয়ে অনেকেই তখন কাঁপছে। শব্দটা বাড়ছেই। ছপাত ছপাত শব্দ। দাঁড় টানতে টানতে কারা যেন এগিয়ে আসছে। খানিকক্ষণ এভাবেই কাটল। বুকের মধ্যে ভয়টা তোলপাড় করছে। পুপু ভয় পেয়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিল। ওর মা তাড়াতাড়ি করে মুখে হাত চাপা দিল। শব্দটা আসতে আসতে সরে যাচ্ছে। সরতে সরতে একসময় মিলিয়ে গেল। বুড়ো সারেঙ তখনো অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। না, ওরা চলে গেছে। আবার আলো জ্বলে উঠল। সারেঙ বলল, "ভেবেছিলাম ডাকাত-টাকাত।"

"ডাকাত?"

"হ্যাঁ বাবু, এসব জায়গায় খুব ডাকাতির ভয়। কুমির-কামটের চেয়েও ওরা ভয়ঙ্কর।

এমন সময় চাঁদ উঠল। জোয়ারের জল বাড়ছে। সারেঙ ওপরে উঠে গেল। স্টিয়ারিং-এ হাত রাখল। টিং টিং শব্দে আবার ঘণ্টি বাজল। লঞ্চটা তখন চলতে শুরু করেছে।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

'গালিভার্স ট্রাভেলস'-এর লেখক জোনাথন সুইফ্‌টকে তাঁর এক প্রাণের বন্ধু প্রায়ই নানারকম জিনিস পাঠাতেন। একটি ছোকরা চাকর সেগুলো পৌঁছে দিয়ে যেত। একদিন কিছু মাছ নিয়ে এসে ছেলেটি যেমন-তেমন করে রেখে চলে যাচ্ছিল। সুইফ্‌ট খুব বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওহে ছোকরা, তুমি দেখছি আদব-কায়দা কিছুই শেখোনি। ঐভাবে কাউকে জিনিস দিতে হয়? এসো শিখিয়ে দিচ্ছি। ধরো তুমি এ-বাড়ির কর্তা, আর আমি মাছগুলো বয়ে এনেছি। আমি বলব, হুজুর, আমার মনিব আপনার জন্যে মাছ পাঠিয়েছেন, আপনি গ্রহণ করলে তিনি খুশি হবেন।" ছোকরা চাকরটি কর্তার ভঙ্গিতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে তক্ষুনি বলল, "বেশ, ঐখানে রেখে যাও, আর এই নাও তোমার বখশিস।" শুনে লজ্জায় সুইফ্‌টের মাথাকাটা। ছেলেটিকে বখশিস দেওয়ার কথাটা তাঁর কোনোদিন খেয়ালই হয়নি।

হাই পাওয়ার সার্ফ ধোয় সবচেয়ে সাদা ক'রে,

এমন, যা নজরে পড়ে!

হাই পাওয়ার সার্ফে আছে বেশী পরিষ্কার করার ক্ষমতা, যা কাপড়ের ধূলোময়লার প্রতিটি কণা তুলে বের ক'রে ফেলে। সত্যিকারের ময়লা জামাকাপড়ও ক'রে তোলে ধবধবে সাদা! তাই তো, বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

বেশীর ভাগ মায়েরা কাপড় ধোয়ার জন্যে অন্য পাউডারের চেয়ে সার্ফই বেশী ব্যবহার করেন।

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন
লিনটাস-SU-220-1810 BG

হারানো কাকাতুয়া

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগের কথা : গবা কি সত্যিই পাগল? উদ্ধববাবুর কেনা কাকাতুয়া বলে, "আলমারিতে টাকা নেই, অন্য জায়গায় আছে।" পাখিটিকে অনেকেই হাতাতে চায়। উদ্ধববাবুর পায়ের কাছে বোমা ফাটে, উড়ো চিঠিতে তাঁকে শাসানো হয়—কাকাতুয়াটিকে না-ছাড়লে তাঁর বিপদ ঘটবে। উদ্ধবের ছেলে রামুর নতুন গৃহশিক্ষক যুধিষ্ঠির জর্দাপান খান। গবার ঘরে মাঝরাত্তিরে যে ঢুকেছিল, তার মুখেও জর্দার গন্ধ। সার্কাসে যে-লোক মুখোশ পরে রোমহর্ষক খেলা দেখাত, সেই কি হরিহর পাড়ুইয়ের খুনের মামলার ফেরারি আসামি? গোপনে তার পরিচয় জানতে তাঁবুতে ঢুকে দারোগা আক্রান্ত। কাকাতুয়া বলে, "রামু, পড়তে বোসো।" উদ্ধব রামুকে বেত মেরেছেন। গোবিন্দর গুপ্ত আশ্রয়ে রামুকে নিয়ে যায় গবা। রাত্তিরে সেখানে আগুন লাগে। তারপর···

॥ ১৬॥

লাফের চোটে গোবিন্দ তিরিশ ফুট খুঁটির ওপরে আরও চারফুট উঁচুতে উঠে গেল। ধনুকের মতো বাঁকা পথে আগুনের বেড়াজাল টপকে গিয়ে পড়ল আরও অন্তত ষোলো সতেরো ফুট দূরে। অন্য কেউ হলে এই বিশাল লাফের পর মাটিতে আছড়ে পড়ে হাড়গোড় ভেঙে দ হয়ে থাকত। কিন্তু গোবিন্দ পড়ল বেড়ালের মতো প্রায় নিঃশব্দে, এবং বিনা ঘটনায়।

পড়ে সে আগুনের দিকে চেয়ে দেখছিল। এত বড় আগুন সে বহুকাল দেখেনি। গেরস্তর খড়ের গাদাগুলো সবই বিশাল। আগুনটাও তেমনি বিকট হয়ে আকাশ ছুঁতে চলেছে। তার চেয়েও বড় কথা, একটু দূরে-দূরে আরও দুটো খড়ের গাদা আছে। আগুনটা যেরকম ফুলকি ছড়াচ্ছে, আর শিখা যেমন উত্তরে বাতাসে দক্ষিণমুখো বেঁকে যাচ্ছে, তাতে আর দুটো গাদা আর গেরস্তর বাড়িতেও আগুন ধরল বলে।

গেরস্ত আর তার বাড়ির মেয়েপুরুষ মিলে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে "গেল, গেল, সব গেল! জল দে, জল দে শিগগিরি।"

কিন্তু এই শীতে টানের সময় খালবিল শুকিয়ে দড়ি। কুয়োর জল পাতালে। এই বিশাল আগুন নেভানো সহজ কর্ম নয়। মুনিশরা লাঠি দিয়ে খড়ের গাদায় পেটাপেটি করছিল বটে, কিন্তু আগুনের তাতে ঝলসে সবাই হটে এল।

অত আগুনের আলোয় চোখ ঝলসে গেছে বলে গোবিন্দর হনুমান-লাফটা কেউ লক্ষ করেনি। গেরস্ত বুক চাপড়ে চিৎকার করে বলছিল, বোবা-কালা অবোধ লোকটা সেদ্দ হয়ে গেল রে। আহা, বেচারি চেঁচানোরও সময় পায়নি।

গোবিন্দ পড়েছিল বেগুন-খেতের মধ্যে। সামনে ডালপালার বেশ উঁচু বেড়া। সুতরাং তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। এই সময়ে হঠাৎ গোবিন্দর মাথায় একটা বুদ্ধি এল। খড়ের গাদায় আগুন লেগে সে মরেছে, একথাটা প্রচার হয়ে গেলে কেমন হয়? যারা তাকে মারতে চেয়েছিল তারা অন্তত কিছুদিন নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে।

গাঁ-সুদ্ধু লোক আগুন দেখতে ধেয়ে আসছে। গোবিন্দর উচিত ছিল এই অবস্থায় গেরস্তকে কিছু সাহায্য করা। কিন্তু সে দেখল, এই আগুনকে কব্জায় আনা তার অসাধ্য। গেরস্তর কপাল ভাল থাকলে বাঁচবে।

এই ভেবে গোবিন্দ হামাগুড়ি দিয়ে বেগুন-খেতের পিছনে বাঁশের বেড়া ডিঙিয়ে বাঁশবনে পড়ল। জিনিসপত্র কিছু পড়ে রইল বটে গেরস্ত বাড়িতে, কিন্তু সে তেমন কিছু নয়।

ঘুরপথে হেঁটে সে শহরের রাস্তায় উঠে পড়ল। খুবই অন্ধকার আর ঠাণ্ডা রাত। চারদিকে হিম কুয়াশা। গোবিন্দ তার গায়ের কাঁথাটা পর্যন্ত আনেনি। শীতে একেবারে জমে যাচ্ছে। এই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় খুব জোরে জোরে হাঁটা। গোবিন্দ হাঁটতে লাগল।

এতকাল ফাঁসির দড়ির ভয় ছিল। পুলিশের ভয় ছিল। এবার তার সঙ্গে এ আর এক অচেনা বিপদ এসে জুটল। সাতনা। কিন্তু আগুন যে সাতনাই দিয়েছে, তার কোনো মানে নেই।

তবে কে? গোবিন্দকে মেরে তার কী লাভ?

ভাবতে ভাবতে কূলকিনারা পায় না গোবিন্দ। সে বুদ্ধিমান বটে, কিন্তু আজকের আচমকা সব ঘটনায় বুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা মাথায় সবটা বিশ্লেষণ করতে পারছে না।

গাঁয়ের সীমানা ডিঙিয়ে যখন খোলা মাঠে পা দেবে গোবিন্দ, তখন হঠাৎ পিছনে শুনল কে যেন দৌড়ে আসছে। তবে এক জোড়া পায়ের আওয়াজ।

গোবিন্দ একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। লোকটা শত্রু হলেও যদি একা হয় তবে গোবিন্দর ভয় নেই। যে-কোনো একজন লোকের সঙ্গে সে অনায়াসে পাল্লা টানতে পারবে।

কে যেন ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে ডাকল, "রাখালদা! ও রাখালদা।"

গেরস্তর মেজো ছেলে। গোবিন্দ চাপা স্বরে বলল, "এখানে।"

অন্ধকার খানিকটা চোখ-সওয়া হয়ে গেছে। ছায়ামূর্তির মতো ছেলেটাকে দেখতে পেল গোবিন্দ।

কাছে এসে হাঁফাতে-হাঁফাতে সে জিজ্ঞেস করল, "পালাচ্ছ কেন?"

"না পালিয়ে উপায় নেই। তোমাদের বাড়িতে কি আগুনটা ছড়িয়েছে?"

"না। গাঁয়ের লোকেরা বড় বড় বাঁশ দিয়ে গাদার আগুন প্রায় ঠাণ্ডা করে এনেছে। খড়ের আগুন বেশিক্ষণ তো থাকে না।"

"আমি যে পালিয়েছি, তা জানলে কী করে?"

"আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম যে। মনে হচ্ছিল, তুমি অত সহজে মরার পাত্র নও। ঠিক বেঁচে যাবে। তোমাকে লাফ দিয়ে বেগুন-খেতে পড়তেও দেখেছি।"

"আর কেউ দেখেনি তো?"

"আমাদের বাড়ির কেউই দেখেনি। তবে তুমি পালানোর পর লম্বা আর জোয়ান একটা লোক বেগুনখেতে গিয়ে টর্চ জ্বেলে কী যেন দেখছিল। সে এই গাঁয়ের লোক নয়।"

গোবিন্দ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সাতনা।

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কে গোবিন্দদা?"

সংস্কৃতির কলকাতা

কলকাতার ভিড় থেকে একখামচা মানুষ তুলে নিলেই সারা ভারতের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যাবে।

কথাটা কিছু অতিরঞ্জন হলেও সত্যি। ভারতের সমস্ত রাজ্যের মানুষই এখানে মিলেমিশে একাকার। কলকাতার "আত্মা" খুঁজতে হলে কিন্তু এই সর্বধর্ম, সর্বজাতের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কথাটাই ভাল করে বুঝে নিতে হবে।

কলকাতার যে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা গর্ব করি সেটা হলো মানুষকে মানুষ হিসেবে অর্থাৎ সমস্ত জাতপাতের ঊর্ধে স্থান দেওয়ার বিশেষত্ব।

আরও বিশেষত্ব আছে—কলকাতা সব সময় অত্যাচার আর শোষণের বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত। এখানকার ইতিহাসের শিক্ষাই হচ্ছে সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। সেই-জন্য কলকাতা সব কিছু গ্রহণ করছে উদারভাবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্জন করছে যা কিছু নিকৃষ্ট এবং যা কিছু অরুচিকর।

অবশ্য একথা ভুললে চলবে না যে সুস্থ সংস্কৃতির এবং চিন্তাধারার ওপর আঘাত সব সময়ই আসছে। তার প্রভাবও সমাজ জীবনে কিছুটা পড়ছে। এখন আমাদের সব সময় সচেতন থাকতে হবে যাতে কলকাতা তার বৈশিষ্ট্য না হারায়।

তোমাদের ওপর বিশেষ দায়িত্ব এবং বিশেষ ভরসা। কারণ তোমরাই তো কলকাতার ভবিষ্যৎ নাগরিক। কোনও সময়েই যেন কেউ সংকীর্ণতার শিকার না হয়, এটাই চাইছি।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, ৩-এ, অকল্যান্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত।)

"একটা দুঃখী লোক। দুঃখ অনেক সময় মানুষের ভাল করে। কখনো-কখনো খারাপও করে। এ-লোকটার খারাপ করেছে।"

"তার মানে?"

"গল্পটা বলার তো সময় নেই। লোকটা কী করল বল।"

"কিছু করল না। খানিকক্ষণ চারদিক দেখে খুব গম্ভীর মুখে একদিকে চলে গেল।"

"সঙ্গে কাউকে দেখলে?"

"কাউকে না।"

"তাহলে ঐ লোকটাও জানে যে, আমি মরিনি!"

"তা জানতে পারে। কিন্তু আগুনটা দিল কে বলো তো। বাবার ধারণা তুমি বিড়ি খেতে গিয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে এনেছ। সত্যি নাকি?"

ম্লান হেসে গোবিন্দ বলে, "খেলোয়াড়দের বিড়ি সিগারেট খাওয়া বারণ জানো না?"

ছেলেটা অবাক হয়ে বলে, "তুমি খেলোয়াড় নাকি? কিসের খেলোয়াড়?"

"সারকাসের। কিন্তু সে-গল্পও আর একদিন শুনো।"

"বাঃ রে, এসব কথা আমাকে বলোনি কেন?"

"তুমি ছেলেমানুষ। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইনি।"

"কিসের বিপদ?"

"এখন বলার সময় নেই।"

গেরস্তর মেজো ছেলে অভিমানভরে বলল, "কিছুই তো আমাকে বলছ না। কিন্তু আমি যে তোমাকে খুব ভালবাসতাম।"

গোবিন্দ একটু ভাবল। তারপর বলল, "বেশ কিছুদিন আগে কাশিমের চরে একটা লোক খুন হয়েছিল। তার নাম হরিহর পাড়ুই। জানো?"

"জানি। সারকাসের খেলোয়াড়, মাস্টার গোবিন্দর তো সেই জন্যই ফাঁসি হবে।"

"হয়নি। কারণ আমিই গোবিন্দ মাস্টার।"

"তুমি?" বলে যেন ভূত দেখে আঁতকে ওঠে ছেলেটা।

গোবিন্দ তার কাঁধে হাত রেখে বলে, "খুনটা যে আমি করিনি সেটা অনেকেই বিশ্বাস করে

না। তবে হরিহরের সঙ্গে সেই রাতে কাশিমের চরে আমি গিয়েছিলাম বটে।"

"তবে কে খুনটা করল?"

"তা জানি না। কিন্তু জানতেই হবে। যেমন করেই হোক। খুনিকে ধরতে না পারলে পুলিস শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরবেই।"

"তাহলে তুমি পালাও।"

"তাই পালাচ্ছি।" (ক্রমশ)

ছবি দেবাশিস দেব

শিশিরকুমার বসু

॥ ২৯ ॥

১৯৩৯-এর জানুয়ারির শেষে ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি-নির্বাচন হল। এ-ধরনের নির্বাচন কংগ্রেসের ইতিহাসে আর হয়নি। সেই সময় আমাদের বড় দাদার বিয়ে লাগল। বাড়ির বড় ছেলের বিয়ে, সেজন্য কলকাতায় আত্মীয়স্বজনদের বেশ একটা বড় জমায়েত হল। যেদিন কংগ্রেস-সভাপতি নির্বাচনে সারা দেশে ভোট নেওয়া হচ্ছে সেই দিনই বিকালে বাবা উডবার্ন পার্কের সাউথ ক্লাবের মাঠে বিয়ের চা-পার্টি দিচ্ছেন। রাঙাকাকাবাবুও

ত্রিপুরীতে রাঙাকাকাবাবুকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নামানো হচ্ছে

আছেন। একে-একে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ফলাফল জানা যাচ্ছে হয় টেলিগ্রাম বা প্রেস মারফত—দৌড়ে এসে কেউ-না-কেউ খবরটা দিয়ে যাচ্ছেন। সে কী উত্তেজনা। প্রথমটা প্রতিযোগিতা খুবই তীব্র মনে হচ্ছিল, ভোট প্রায় সমান-সমান চলছিল।

রাঙাকাকাবাবু চা খাচ্ছেন আর শান্তভাবে হিসেব করে দেখছেন, ভোটের ধারা সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে নিজের মন্তব্য করছেন। ক্রমে এটা বোঝা গেল যে, রাঙাকাকাবাবুর দিকের পাল্লাটাই ভারী। চা-পার্টি শেষ হবার পর রাঙাকাকাবাবু এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর অফিসঘরে গিয়ে বসলেন। বাড়ির ছোটবড় সকলেই আমরা তাঁকে ঘিরে রইলাম। শেষের ফলাফলগুলো তখন আসছে। রাঙাকাকাবাবু ক্রমাগতই টেলিফোনে কথা বলছেন। এই সূত্রে একটা কথা আমার মনে গেঁথে আছে। প্রত্যেক বারই বলছেন "আমরা জিতছি" বা "আমরা জিতব", একবারও ভুলে বলছেন না যে "আমি জিতছি"। এই সামান্য কথার মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত নয়, সকলে মিলে একটা আদর্শের জন্য লড়াই।

আর-একটা কথাও মনে আছে। রাঙাকাকাবাবুর নির্বাচনের জয়ের খবরে বাড়ির ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সুরে কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন। যেন এটা ছিল সর্বভারতীয় শক্তির বিরুদ্ধে বাংলার একটা সাফল্য বা কৃতিত্ব। রাঙাকাকাবাবু কিন্তু এই ধরনের কথাবার্তা ও ধারণা সঙ্গে-সঙ্গেই সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাছাড়া গান্ধীজির একটা খুবই দুঃখজনক মন্তব্যের পরেও তিনি তাঁর মানসিক স্থৈর্য হারাননি। নির্বাচনের ফল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কোনো হীন আপসের বিরুদ্ধে রায় বলে মেনে নিয়ে তিনি আবার কংগ্রেসের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন।

সপ্তাহ-দুই পরে রাঙাকাকাবাবু ওয়ার্ধায় গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কলকাতা ফেরবার পথে ট্রেনেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। মনে হয়, অসুখের গুরুত্বটা তিনি নিজেও ঠিক বুঝতে পারেননি। কলকাতায় ফিরে তিনি স্বাভাবিক কাজকর্ম করার চেষ্টা

রাঙাকাকাবাবু ও ছেলে-বৌদের সঙ্গে মা-জননী

করলেন। দু-একদিন পরেই সফরে বের হবার কথা। ভাবলেন প্রোগ্রাম ঠিকই চলবে। কিন্তু একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। সব কাজকর্ম বন্ধ হল, সফর বাতিল হল। নতুনকাকাবাবু ডাঃ সুনীল বসুকে রাঙাকাকাবাবুর স্বাস্থ্য নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হতে কখনও দেখিনি। ডাঃ নীলরতন সরকার, ডাঃ মণি দে-র মতো বড়-বড় ডাক্তার প্রায়ই যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। রাঙাকাকাবাবু গোঁ ধরে বসলেন, যাই হোক না কেন, মার্চ মাসের প্রথমে ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁকে যেতেই হবে। ডাক্তাররা বললেন, তিনি যদি ডাক্তারদের সব নির্দেশ না মেনে চলেন তাহলে ত্রিপুরী কংগ্রেসে যাওয়ার আশাও তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। এদিকে আবার ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মীটিং ওয়ার্ধায় বসবার কথা। ওয়ার্কিং কমিটির মীটিং-এ যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। রাঙাকাকাবাবু কমিটির মীটিং পেছিয়ে দেবার প্রস্তাব করলেন। উত্তরে কমিটির প্রায় সব সদস্যই পদত্যাগ করে বসলেন। চারদিক থেকে নানা রকম বিপদ যেন রাঙাকাকাবাবুকে চেপে ধরল। তাঁর অসুখ নিয়ে কেবল ডাক্তাররাই নয়, বাড়ির সকলেই খুবই শঙ্কিত হয়ে ছিলেন। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তাঁকে আবার বেশ একটা বড় রকমের রাজনৈতিক লড়াইও লড়তে হচ্ছিল। রাঙাকাকাবাবু নিজেই পরে লিখেছিলেন যে, জীবনে তিনি অনেক ভুগেছেন কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসের সময় এক মাস তিনি যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পেয়েছিলেন, সেরকম কষ্ট জীবনে পাননি। রোগ নির্ণয় করতে ডাক্তারদের অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ উপসর্গগুলি ছিল অদ্ভুত ধরনের। জ্বর আসে যায় কিন্তু কিছুতেই ছাড়ে না। রাঙাকাকাবাবুর কাছে শুনেছি, দুই ফুসফুসেই নাকি এক মারাত্মক রকমের নিউমোনিয়া হয়েছিল এবং রাঙাকাকাবাবু সেযাত্রায় রক্ষা পাবেন কিনা সেবিষয়ে ডাক্তারদের বেশ সন্দেহ ছিল।

যাই হোক, রাঙাকাকাবাবু ত্রিপুরী যাবেনই। নতুনকাকাবাবু দুজন সহকারী ডাক্তার নিয়ে সঙ্গে যাবেন, বাড়ির আরও অনেকে সঙ্গে থাকবেন। আমি ত্রিপুরী যাইনি, সেখানকার সব ঘটনার কথা বাবা মা ও অন্যান্যদের কাছে পরে শুনেছিলাম। বাড়ি থেকে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত তো অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে দিয়ে যাওয়া হল। রাঙাকাকাবাবু যখন ত্রিপুরীর সভাপতির ক্যাম্পে পৌঁছলেন তখন তাঁর জ্বর ১০৩ ডিগ্রি। কংগ্রেস ক্যাম্পের ডাক্তাররা তাঁর অবস্থা দেখে

"নিখুঁত পরিষ্কার"

"হুইল যে কি জিনিষ, আমার বৌমাটি তো তা জানতোই না। এইসব নতুনের দলেদের কি আর বলব, এখনও সেই পুরোনপন্থী হয়েই রয়েছে! হুইল-এ যে কত সাশ্রয় হয় তা ওকে বোঝালাম—আর এও বললাম যে, প্রতিটি বার-এ চারটি ক'রে ভাগ থাকে। আর তারপর ও এই বিপুল ফেনার রাশি আর কাপড়ের সমস্ত ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে তো একেবারে অবাক! হুইল-এ কাপড় কাচলে কাপড় পরিষ্কারও হয় সাবানের চেয়ে বেশী আর কাপড় ধোয়াও যায় অনেক বেশী! তাই তো এখন হুইল-এর ওপর ওর দারুণ বিশ্বাস জন্মে গেছে—সাবানের আর দরকারটাই বা কি বলুন তো?"

হুইল

দারুণ ধোলাই শক্তি- চড়া দাম থেকে মুক্তি!

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-WL.12-1810 BG

খুবই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। শুনেছি তাঁরা নাকি বলেছিলেন, তাঁকে জব্বলপুরের ভাল হাসপাতালে রাখা হোক, ক্যাম্পে রাখাটা নিরাপদ নয়। রোগী নিজে কিন্তু ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অনেক জ্বর নিয়েও রাঙাকাকাবাবু অ্যাম্বুলেন্সে চেপে মণ্ডপে গিয়ে বিষয়-নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেন। ফলে তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হয়। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে তাঁকে যেতে দেওয়া হয়নি। বাবা তাঁর অভিভাষণ পড়েছিলেন। শুনেছি ক্যাম্পে শুয়ে-শুয়ে তিনি মাইক্রোফোনে বাবার গলা শোনার অপেক্ষায় থাকতেন। মাঝে-মাঝে বলে উঠতেন, ঐ শোনো, মেজদা বলছেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসে এমন একটি প্রস্তাব পাস হল যাতে করে সভাপতির হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয় বলা যেতে পারে। যাঁদের রাঙাকাকাবাবু তাঁর সমর্থক বলে মনে করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই অন্য দিকে চলে যান কিংবা কোনো অজুহাত দেখিয়ে দু' নৌকোয় পা রেখে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করেন। তাছাড়া ত্রিপুরীতে উপরতলার রাজনৈতিক মহলের ক্ষুদ্রতা রাঙাকাকাবাবুকে বিশেষ পীড়া দিয়েছিল। তিনি পরে লেখেন, এতই বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে সবকিছু ছেড়ে হিমালয়ের কোলে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা তাঁর আবার জেগেছিল। কিন্তু ঐ সাময়িক দুর্বলতা তিনি কাটিয়ে উঠেছিলেন। ভারতের সব প্রান্তের অগণিত লোকের ভালবাসা ও সমর্থনের যথেষ্ট পরিচয় তিনি নানা ভাবে পেয়েছিলেন। ফলে তাঁর মনের বল আবার ফিরে এসেছিল। ত্রিপুরী যে আসল ভারতবর্ষের প্রতিভূ নয় তা তিনি বুঝেছিলেন এবং আবার দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন।

ডাক্তারদের ও বাড়ির সকলের মত হল যে, ত্রিপুরীর পর রাঙাকাকাবাবুকে কলকাতায় না এনে অন্তত কিছু দিন অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে রাখা উচিত। কলকাতার পথে ধানবাদে তাঁকে নামিয়ে নেওয়া হল এবং আমাদের নকাকাবাবু সুধীরচন্দ্রের জামাডোবার বাংলোতে তোলা হল।

(ক্রমশ)

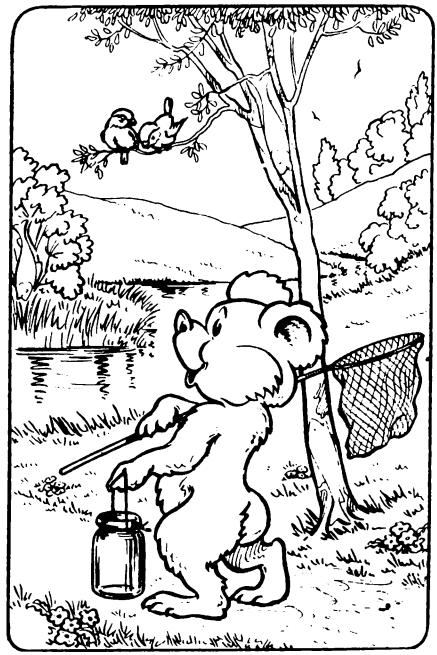

ছবির মজা

ভালুক-মশাই জাল দিয়ে মাছ ধরতে চলেছেন। অথচ, নদীতে নয়, এদিকে-ওদিকে লুকিয়ে আছে তিন-তিনটি মাছ। খুঁজে বার করো। করেছ? এইবার রঙ-পেনসিল বুলিয়ে ছবিটিকে রঙিন করো, কেমন?

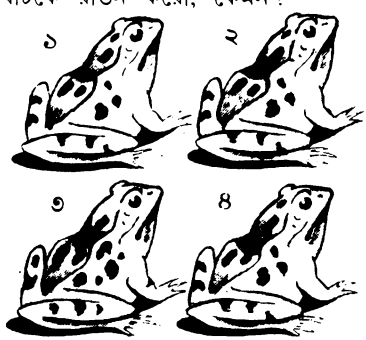

চারটে ব্যাঙ। বৃষ্টির সময় তো, তাই গ্যাঙোর-গ্যাঙ গ্যাঙোর-গ্যাঙ গান জুড়ে দিয়েছে। একটা ব্যাঙ কিন্তু অন্য-তিনটির থেকে একটু আলাদা। কোন্‌টা, বলতে পারো?

(তিন-নম্বর ব্যাঙের গায়ের ছিটে অন্যরকম।)

মিঠুয়ার বন্ধু রুস্তম

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিঠুয়ারা শিলং ছেড়ে চলে যাবে। ওর বাবা ওদের ছবির মতো সুন্দর বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিন ওদেরই এক প্রতিবেশী রবিন লিংডোর কাছে। ঠিক হয়েছে, ওরা চলে গেলেই বাড়ির দখল নেবেন লিংডো। ইতিমধ্যে নিজের বেশ কিছু জিনিসপত্রও তিনি রেখে গেছেন ও বাড়িতে।

এদিকে অনেক চেষ্টাচরিত্র করে ওর বাবা নিজের বদলি করিয়েছেন শিলিগুড়িতে। সামনের মাসের এক তারিখেই যোগ দিতে হবে শিলিগুড়ির অফিসে। তাই সবকিছুর তোড়জোড় গোছগাছ চলছে পুরোদমে। পুরনো পাইন কাঠের যত ফারনিচার ছিল, সব বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। কারণ এসব হালকা কাঠের ফারনিচার শিলং থেকে শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়ায় অনেক ঝুটঝামেলা। তাছাড়া নিয়ে গিয়ে কোনো লাভও নেই। শিলিগুড়ির গরমে পাইন কাঠ ফেটে চৌচির হবে। কিছু-কিছু জিনিসপত্র পুরনো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এসব দেখে মিঠুয়া মনখারাপ করে ঘুরে বেড়ায়। ভাবে, এত সুন্দর সাধের শিলং ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওদের বাড়ি শিলংয়ের লাবানে, লুম্পারিং নদীর ধারে একটা টিলার ওপরে। বাড়ির বারান্দা থেকে চোখে পড়ে, দূরে সবুজ পালকের মতো গ্যারিসন গ্রাউণ্ড। মাঝে মাঝে ওখানে কেমন আর্মির মেলা হত। কত বড় মেলা। তাতে জিনিসপত্র বিক্রি, খাওয়া দাওয়া, আরো কত মজা। গ্যারিসন গ্রাউণ্ডের এপাশে রেডক্রস হাসপাতাল। মা বলেছে, বছর দশেক আগে ওখানেই একদিন জন্ম হয়েছিল মিঠুয়ার। তার পাশে লেডি হায়দারি পার্ক, সঙ্গে কী সুন্দর চিড়িয়াখানা। সেই চিড়িয়াখানায় কত ধরনের বেড়াল। এই বেড়ালগুলি দেখলেই কেমন ভয় হত। মনে হত যেন সত্যিই এই বেড়ালগুলি বাঘের মাসি। নদীর ওপারে মৌ, ঝিমলিদি, পার্থ, সম্রাট ও মিনিদের বাড়ি পরপর। ওদের সবাইকে ছেড়ে যেতে হবে ভেবে মিঠুয়ার মনটা বিষন্ন মেঘলা হয়ে ওঠে চেরাপুঞ্জির আকাশের মতো।

কিন্তু ওদের সকলকে হারানোর চেয়েও যে-দুঃখ ওর বুকে সবচেয়ে বেশি বাজছে, তা হল ওর প্রিয় কুকুর রুস্তমকে শিলংয়ে ছেড়ে যাওয়া। রুস্তম শুধু ওদের বাড়ির পাহারাদার কুকুর নয়, ও ছিল মিঠুয়ার খেলার সাথী।

রোজ নিজের হাতে আদর করে খাওয়াত মিঠুয়া। এক কথায় মিঠুয়ার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। আর বন্ধু হবে না-ই বা কেন! বছর দুয়েক আগে মিঠুয়ারা যখন বেড়াতে গিয়েছিল এলিফ্যান্ট ফলসে, সেই সময় জলপ্রপাতের ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিল রুস্তমকে। তখন বড়জোর মাসখানেক বয়েস। সাদা ধবধবে কুকুরের বাচ্চা দেখেই মায়ায় পড়ে গেল। সত্যি বলতে কী, সেদিন মিঠুয়ারই আগ্রহে কুকুরের বাচ্চাটাকে তুলে আনা হল শিলংয়ের বাড়িতে। পরে নামকরণ হল বীর রুস্তমের নামে। সেই ছোট্ট এক মাসের কুকুরের বাচ্চা আজ মিঠুয়ার আদরে আর যত্নে বড়সড় কুকুর। ওর দাপটে চোর-ডাকাত এই বাড়ির ত্রিসীমানায় পা দিতে ভয় পায়।

কিন্তু এই রুস্তমকেই এখন ওর বাবা বিক্রি করে দিচ্ছে লাবানের গণ্যমান্য ব্যক্তি মতিউল হকের কাছে। ভদ্রলোকের কুকুর পোষার খুব শখ। দেশবিদেশের নানা জাতের কুকুর আছে ওঁর বাড়িতে।

রুস্তমকে বিক্রি করে দেবার কথা শুনে প্রথমেই আপত্তি জানিয়েছিল মিঠুয়া, "কেন বাবা রুস্তমকে বিক্রি করে দিচ্ছ হক সাহেবের কাছে? ও আমাদের সঙ্গেই চলুক না শিলিগুড়িতে।"

"না না, তা কী করে হয়! পাহাড়ি কুকুর, ও কি শিলিগুড়ির গরমে থাকতে পারবে?"

"কেন পারবে না বাবা? আমাদের মতো ওরও অভ্যেস হয়ে যাবে একদিন।"

"না না। ওর অভ্যেস বদলানো খুব কঠিন। কুকুর তো আর মানুষ নয়।"

উত্তরে মিঠুয়া কী যেন বলতে গিয়েছিল, কিন্তু বাবার গম্ভীর মুখ দেখে আর কথা বাড়াতে সাহস হয়নি।

মিঠুয়া গতরাতে স্বপ্ন দেখেছে রুস্তমকে। ওর খেলার প্রিয় সঙ্গী রুস্তমকে। দেখে, রুস্তমকে নিয়ে গেছে মতিউল হকের লোকজন। রুস্তমকে রেখেছে আলাদা কাঠের ঘরে। মিঠুয়াদের বাড়ি ছেড়ে গিয়ে রুস্তমের মন খুবই খারাপ। বারবার করুণ চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় মিঠুয়াদের ছেড়ে যাওয়া শূন্য বাড়ির দিকে। রুস্তমের অসহায় চোখমুখ দেখে মিঠুয়ার চোখে জল। ঝাপসা চোখে স্বপ্নের মধ্যেই আচমকা দেখতে পায় মিঠুয়া, মতিউল হকের বাড়িতে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে চিৎকার সোরগোল। বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এসে বাইরে অন্ধকারে ছোটাছুটি করছে। ক্রমে আগুন ছড়িয়ে পড়ে কুকুরের বাক্সগুলিতে। রুস্তমের কাঠের বাক্সও জ্বলতে শুরু করে এক সময়। অসহায় রুস্তমের গলা থেকে ভেসে আসে অন্তিম আর্তনাদ, 'ঘেউ···ঘেউয়া·····ঘিউয়া·····'

বহুদূর থেকে যেন মিঠুয়া শুনতে পায়, রুস্তম ওকে ডাকছে আকুলস্বরে, 'মিঠুয়া·· মিঠুয়া!'

স্বপ্নের মধ্যেও ব্যাপারটা এত নিষ্ঠুর সত্যি যে, এক ঝটকায় মিঠুয়া উঠে পড়ে বিছানা থেকে। গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে বাইরে।

দেখে ভোর হয়ে এসেছে। মতিউল হকের বাড়িতে নয়, ওদেরই বাড়ির কুকুরের খাঁচায়, কম্বলের ভেতরে বড় তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে আছে রুস্তম। মিঠুয়ার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে দীর্ঘনিশ্বাস। মিঠুয়া সেই শীতের ভোরে তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেলে, রুস্তমকে কিছুতেই বিক্রি করতে দেবে না।

তবু যদি বাবা আপত্তি করে, তাহলে বাবাকে বলবে মিঠুয়া, "তবে আমাকেও রুস্তমের সঙ্গে বিক্রি করে দাও বাবা।"

ছবি অনুপ রায়

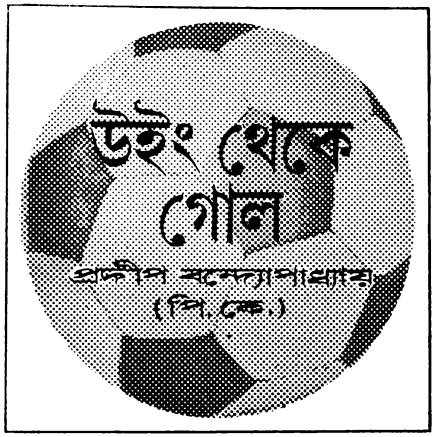

॥ ২৩ ॥

সেদিন মেলবোর্নে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রাশিয়া কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলছে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে। শুনেছিলাম, এক বিখ্যাত যুগোশ্লাভ কোচ ইন্দোনেশীয় ফুটবলারদের টানা দু' মাস তালিম দিয়েছেন। তবু রাশিয়া যে অনেক গোলের ব্যবধানে জিতবে, সে-ব্যাপারে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। উনিশশো পঞ্চান্নয় ভারতের মাটিতে রাশিয়ার ফুটবলাররা যে-খেলা খেলে গিয়েছিলেন, তা তো ভোলা সম্ভব নয়। জানতাম, এশিয়ার কোনো দেশের পক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়।

ইন্দোনেশিয়ার একজন ফরোয়ার্ড সামনে থাকলেন। বাকি দশজন মিলে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ গড়ে তুললেন। নেটো, তাতুশ্চিন আর স্ত্রেলশভের মতো বাঘা ফুটবলাররাও সেই দুর্গ ভাঙতে পারলেন না। খেলা ড্র থাকল। রিপ্লে ম্যাচে অবশ্য টানা আক্রমণের বদলে আচমকা আক্রমণের কৌশল নিয়ে রাশিয়া অনায়াসে চার গোলে জিতে গেল। কিন্তু প্রথম দিনের খেলা দেখেই আমরা মনে জোর পেয়েছিলাম, প্রাণপণ লড়তে পারলে শক্তিশালী দলকেও রুখে দেওয়া যায়। ইন্দোনেশিয়া যদি রাশিয়াকে রুখে দিতে পারে, আমরাই বা যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না কেন?

রাশিয়ার খেলা দেখে ফিরে রহিমসাহেব বললেন, "তুমি তাতুশ্চিনের মতো খেলতে পারবে?" আমি বললাম, "তাতুশ্চিনের শটের নিশানা অনেক নিখুঁত, আউটসাইড ডজ তুলনাহীন, তাঁর অভিজ্ঞতাও অনেক বেশি। তবে স্পীড আর শট আমার কিছু কম নেই। চেষ্টা করলে তাতুশ্চিনের কাছাকাছি উইঙ্গার নিশ্চয় হতে পারব।"

ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে তাতুশ্চিন একটা গোল করালেন, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। একাধিক ডিফেনডারকে অবলীলাক্রমে কাটিয়ে ছয় গজের সীমানায় ঢুকে পড়লেন। তারপর, কাছে টেনে গোলকীপারের পেটের নীচ দিয়ে গড়ানো পাস বাড়ালেন স্ত্রেলশভের দিকে। স্ত্রেলশভের আর কিছুই করার ছিল না, শুধু একটি আলতো টোকায় বলটি গোলে ঢুকিয়ে দেওয়া ছাড়া।

যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচে দলে একটা বড় পরিবর্তন করতে হল। অধিনায়ক সমর ব্যানার্জি আহত থাকায় খেলতে পারলেন না। তাঁর বদলে রাইট ইনসাইড হিসেবে দলে এলেন নিখিল নন্দী। নিখিলদা উইং হাফ খেলতেন। সম্ভবত রহিমসাহেব আমাদের রক্ষণভাগকে বেশি মজবুত করতে চেয়েছিলেন। চার বছর আগে উনিশশো বাহান্নর হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে এই যুগোশ্লাভিয়া ভারতকে ১০—১ গোলে হারিয়েছিল। রহিমসাহেব তাই চেয়েছিলেন, অন্তত বেশি গোল যেন না খেতে হয়।

নিখিলদা আমাদের রক্ষণভাগকে অনেকটা সাহায্য করলেন ঠিকই, কিন্তু আক্রমণে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে তাঁর দিকের উইঙ্গার হিসেবে আমাকে প্রায় সময়েই উপোসি থাকতে হল।

খেলা শুরু হবার মিনিট কুড়ি বাদে রহমান একটা বল আমার দিকে তুলে দিল। সেই বল নিয়ে দৌড় শুরু করলাম। যুগোশ্লাভিয়ার লেফট ব্যাক কেটে গেলেও আমার পিছনে ধাওয়া করা ছাড়ল না। কর্নার ফ্ল্যাগ আর গোল পোস্টের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে দেখি নেভিল ডিসুজা লেফট ইনসাইডের জায়গায় চলে গেছেন। মাঝখানে দৈত্যের মতো চেহারার গোলকীপার। সাইড ব্যাকও বলের সামনে। বল ঠিকমতো আয়ত্তে রেখে সেন্টার করা সম্ভব ছিল না। বলতে গেলে ডাইভ দিয়েই ব্যাক পাস করলাম নেভিল

ডিসুজার উদ্দেশে। ফাঁকায় বল পেলেন নেভিল, মাত্র ছয় গজ দূরে গোল এবং অসহায় গোলকীপার। ঐরকম জায়গা থেকে চোখ বুজে গোল করতে পারতেন নেভিল। বল না থামিয়েই পা চালালেন। বল বারের অনেক ওপর দিয়ে ভেসে গেল!

হাফটাইম পর্যন্ত কোনো গোল হল না। প্রায় সমানে-সমানে খেলা। পায়ে ক্র্যাম্প হওয়া এড়াতে হাফটাইমের সময় দুটো সল্ট ট্যাবলেট খেলাম। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম, প্রচণ্ড টেনশনে থাকায় সারাদিন প্রায় কিছুই খাইনি। হঠাৎ বমি শুরু হল। রহিমসাহেব ভুল বুঝলেন। বললেন, নার্ভাস হয়ে গেছ? এমন দিনে তুমি বসে যেতে চাইছ!

কিছু না বলে মাঠে নামলাম। আটান্ন মিনিট পর্যন্ত কোনো গোল হয়নি। কিট্টু চমৎকারভাবে বল বাড়ান কানাইয়ানের দিকে। কানাইয়ানের কাছ থেকে নেভিল ডিসুজা যখন বল পান, গোল তখনও চল্লিশ গজ দূরে। নেভিল ডান পায়ের আউটসাইড আর ইনসাইড ডজ কাজে লাগিয়ে তরতর করে এগোলেন। গোল থেকে প্রায় দশ গজ দূরে এসে যুগোশ্লাভিয়ার স্টপারকে আউটসাইড দেখিয়ে ইনসাইড ডজ করলেন। তারপর একটি অনবদ্য পুশ'—ভারত এক গোলে এগিয়ে গেল।

আটষট্টি মিনিট পর্যন্ত আমরা এক গোলে এগিয়ে। সামনে অলিম্পিক ফাইনালে যাওয়ার সোনালি সম্ভাবনা।

রাইট ব্যাক রহমান এতক্ষণ ভালই খেলেছেন। হঠাৎ বিপদ ডেকে আনলেন অযথা ড্রিবল করতে গিয়ে। সামনে যুগোশ্লাভিয়ার পুরো ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা লেফট আউট, রহমান অনায়াসেই কেম্পিয়া বা আমাকে বল দিয়ে দিতে পারতেন। সেই বল ওদের লেফট আউট কেড়ে নিলেন। দুর্ভাগ্য, রহমান এই সময়েই পিছলে পড়ে গেলেন। লেফট আউট সামান্য এগিয়ে প্রচণ্ড জোরে শট নিলেন, নারায়ণের মাথার পাশ দিয়ে বল গোলে ঢুকে গেল। আহত থাকায় থঙ্গরাজ এইদিন দলে ছিলেন না। থাকলে, এই গোলটি হয়তো আমাদের খেতে হত না।

গোলে বল ঢোকার পরই এক অভূতপূর্ব শ্য দেখা গেল। যুগোশ্লাভিয়ার ফুটবলাররা

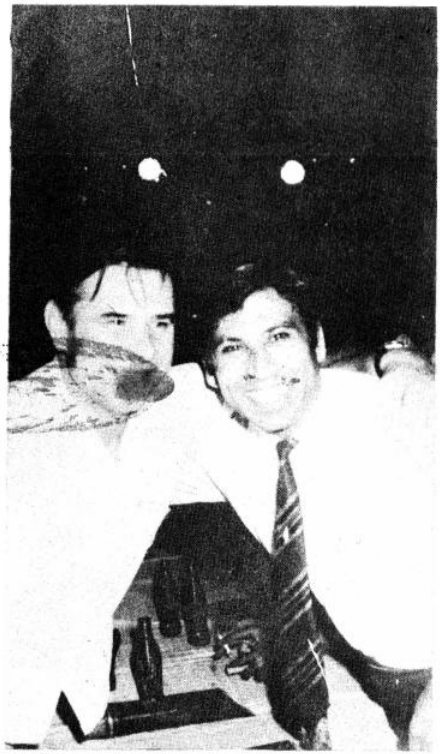

ইয়াসিন ও পি. কে. (বাহাত্তরে, কলকাতায়)

সবাই মিলে সেই বলে ক্রমাগত শট নিতে লাগল। তারপর সেই বলে চুমু খাওয়ার পালা।

এরপর আমরা আর দাঁড়াতে পারিনি। পর পর তিনটি গোল দিয়ে ফাইনালে উঠে যায় যুগোশ্লাভিয়া। খেলার শেষের দিকে আমার কোনোরকম চেতনা ছিল না বললেই চলে। কয়েক মিনিট আগে কিট্টু গোলের সামনে বল তুলতেই মনে হয়েছিল, লাফিয়ে বলে মাথা ছোঁয়াতে পারলে গোল হতে পারে। বল নয়, মাথায় লাগল গোলকীপারের ঘুষি। এবং তারপর ছয় ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা সেই দৈত্যাকার গোলকীপার এই পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির ভারতীয় শরীরের ওপর পড়লেন। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। বাকি সময়টুকু আমি নাকি ভালই লড়েছিলাম, কিন্তু তা বোঝার ক্ষমতা আমার ছিল না। খেলার পর আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় ক্যাম্পে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল।

অন্যদিকে বুলগারিয়াকে হারিয়ে ফাইনালে

আসতে বেগ পেল রাশিয়া। প্রথমে রাশিয়া একটা গোল দিল। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে সেই গোল শোধ। রাশিয়ার ডিফেণ্ডারদের নাকের জলে চোখের জলে করলেন বুলগারিয়ার লেফট ইনসাইড। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শালিনকফের অনবদ্য গোলে জিতে গেল রাশিয়া।

এই ম্যাচের একটি ঘটনার স্মৃতি আমার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। তোমরা হয়তো জানো, ভারতের বিখ্যাত গোলকীপার থঙ্গরাজ হাত দিয়ে বল ছুঁড়ে নির্ভুলভাবে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে ফরোয়ার্ডদের পায়ে দিতে পারতেন। এই ব্যাপারটা থঙ্গরাজ শিখেছিলেন মেলবোর্নে রাশিয়ার বিশ্ববরেণ্য গোলকীপার লেভ ইয়াসিনকে দেখে।

বুলগারিয়ার রাইট উইঙ্গারের একটা সাধারণ শট ধরে ইয়াসিন পেনালটি বক্সের মাথায় উঠে এলেন। রাইট উইঙ্গার তাতুশিনকে বল ছুঁড়ে দিতে গিয়ে লক্ষ করলেন, লেফট ব্যাক অনেক ফাঁকায় আছেন। তাই হঠাৎ লেফট ব্যাকের দিকে বল ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু সেই বল ছুটে গিয়ে ধরে ফেললেন বুলগারিয়ার রাইট আউট।

যেখানেই যান, যে-কাজই করুন
স্বাচ্ছন্দ্যময় চলা-হাঁটার উপরই
নির্ভর করছে আপনার সাফল্য।

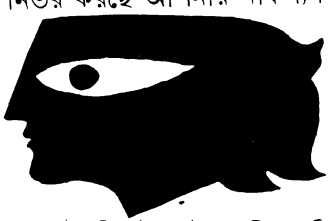

রাজুর তৈরী টেকসই গেঞ্জী,জাঙ্গিয়া,
মোজাই আপনাকে জোগাতে পারে
সেই বাড়তি স্বাচ্ছন্দ্য, এবং কম
খরচে।কেনার সময় খোঁজ করবেন–

১। প্রেসটিজ রঙীন জাঙিয়া
২। রঙীন ড্রয়ার্স
৩। ডাক্কর জাঙিয়া
৪। ফেদার-ফিট রিব গেঞ্জী
৫। ইজিপসিয়ান গেঞ্জী
৬। কুলফিল গেঞ্জী

গেঞ্জী জাঙ্গিয়া
মোজার রাজা

RAJU

তিনি যখন বল নিয়ে গোলের দিকে ছুটছেন, রাশিয়ার সব ডিফেণ্ডারই তখন কিছুটা এগিয়ে। নেটো আর ভয়ানভ ইয়াসিনকে ভর্ৎসনা করতে-করতে পিছনে ছুটছেন। কিন্তু গোল তো অনিবার্য।

ইয়াসিন গোল লাইনে দাঁড়িয়ে তখন টুপি ঠিক করছেন! বুলগারিয়ার সেণ্টার ফরোয়ার্ডও রাইট আউটের সঙ্গে-সঙ্গে উঠে এসেছেন। রাইট আউট যখন আট গজ দূরে, ইয়াসিন বিড়ালের মতো সন্তর্পণে একটু এগোলেন। রাইট আউট যখন মাত্র ছয় গজ দূরে, হঠাৎ এক গজ এগিয়ে তাঁর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইয়াসিন। রাইট আউট সঙ্গে-সঙ্গে বাঁ দিকে সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দিকে বল ঠেলে দিলেন। ইয়াসিন ঠিক এইরকমই অনুমান করেছিলেন। তাই সামনের দিকে ঝাঁপালেও, তাঁর আসল নজর ছিল সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দিকে। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের পায়ে যাওয়ার আগেই প্রায় বারো ফুট উড়ে গিয়ে সেই বল ধরে নিলেন ইয়াসিন। প্রায় দুই মিনিট গোটা স্টেডিয়াম করতালিতে মুখর থাকল।

ফাইনালে যুগোশ্লাভিয়াকে ২—১ গোলে হারিয়ে রাশিয়া অলিম্পিক ফুটবলে সেই প্রথম ও শেষ সোনা পেল।

তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় ভারতকে বুলগারিয়া ৩—০ গোলে হারাল। মাথায় চোট থাকায় এই ম্যাচে আমি খেলিনি। আমাদের টীম ভালই লড়ল। এই প্রথম অলিম্পিক ফুটবলে ভারত চতুর্থ স্থান পেয়ে 'অলিম্পিক ডিপ্লোমা' পেল।

একটা ভাল খবর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ডিউক অফ এডিনবরা মেলবোর্ন অলিম্পিকে এসেছিলেন বিশেষ অতিথি হিসেবে। তাঁর এবং অন্য বিচারকদের বিচারে ভারতীয় ফুটবল দল মেলবোর্ন অলিম্পিকের সবচেয়ে সুশৃঙ্খল দল হিসেবে ঘোষিত হল। শুধু ফুটবল দলগুলির মধ্যে নয়, আমরা স্বীকৃতি পেয়েছিলাম সব খেলার সব দলের মধ্যে সবচেয়ে সুশৃঙ্খল দল হিসেবে। স্বভাবতই রহিমসাহেব খুব খুশি হলেন। কেননা বরাবরই তিনি ছিলেন কঠোর শৃঙ্খলার ভক্ত।

(ক্রমশ)

তিন রকম

সুশীল রায়

হাতি

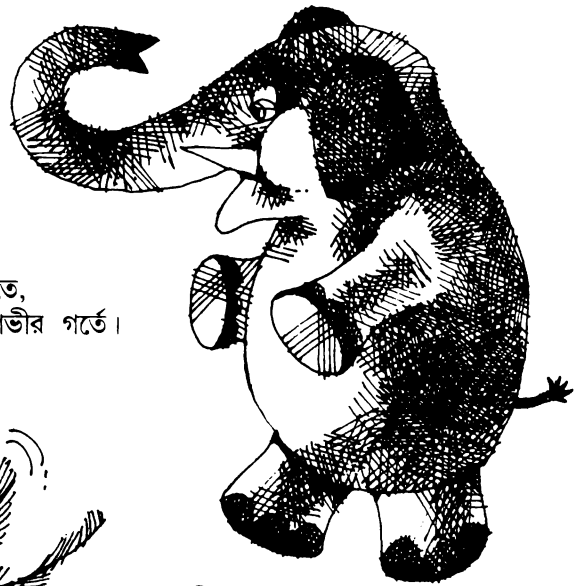

একটা হাতি মূর্খ ছিল ভীষণ,
তাইতে সে প্রাণপণ
চেষ্টা করত বুদ্ধি জাহির করতে,
মস্ত শরীরটাকে নিয়ে পড়ল গভীর গর্তে।

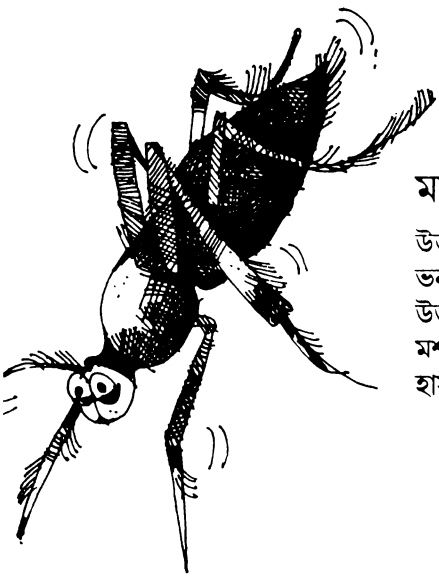

মশা-মাছি

উড়ত বেজায় ফুর্তি নিয়ে
ভনভনিয়ে ভনভনিয়ে
উড়তে গিয়ে একটা মাছি ভীষণ হাঁচি হাঁচল,
মশারা তাই দেখে বেজায় হাসল
হাসতে গিয়ে পেট ফাটাল, প্রাণেতে না বাঁচল।

তীর্থের কাক

কী হয়েছে, কী হয়েছে? চুপটি বসে থাক্,
পরিচয়টা গোপন করে রাখ্।
কিন্তু গলার শব্দ শুনে, দেখে বসার ভঙ্গি
কেউ হবে না সহায় তোদের, কেউ হবে না সঙ্গী।
বুঝতে কে না পারে সবই—
ঘৃণ্য তোরা, তোরা লোভী।
আপন মেজাজ নিয়ে যেন আসিস না কেউ তীর্থে,
মান-ইজ্জত নিয়ে দেশে পারবি না আর ফিরতে।

ছবি দেবাশিস দেব

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

অগ্নিকাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

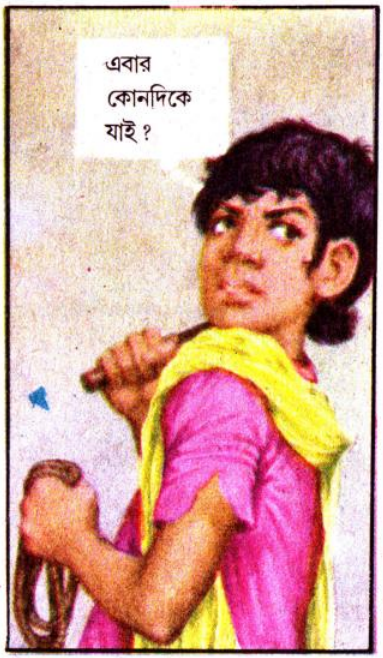

আচমকা · · ·

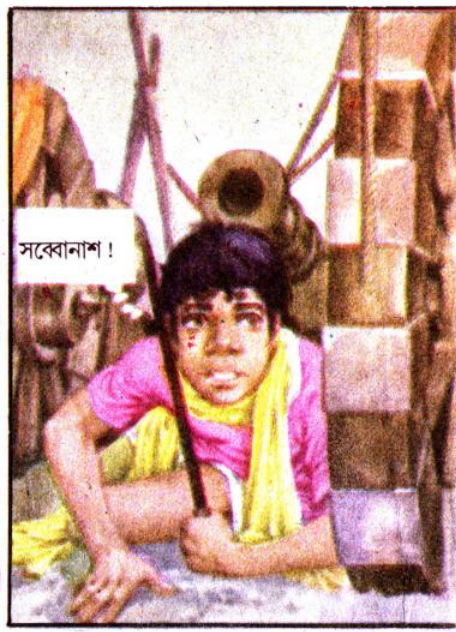

হামাগুড়ি দিয়ে আবার উলটো পথ ধরে সদাশিব···

হঠাৎ কানে আসে···

উঃ, কী বিদঘুটে ঠাণ্ডা রে বাবা! একটু আগুন জ্বালাতে পারলে বড় ভাল হত।

বলছ কী মিঞা? ও-কথা মুখেও এনো না।

সামনেই কানাত-ঢাকা বারুদের পিপে। একটা ফুলকি উড়ে গেলে আর রক্ষে আছে!!

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়

রয় অসুস্থ। তাকে ছাড়াই ফোর্ট মারে ফ্লায়ার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে রোভার্স এক গোলে পিছিয়ে পড়েছে...

রোভার্স কিস্যু খেলতে পারছে না।

অথচ এত নামডাক!

চার্লিও বল ঠেকাতে গিয়ে ভুল করল!

যাঃ!

বল ফিরে আসছে!

টু নিল!

চালিয়ে যাও!

রোভার্সের অবস্থা শোকাবহ!

রয়ের কথা ভেবে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলুম!

সে তো সবাই ভাবছি!

কিন্তু আমরা হারলে কি রয় সুস্থ হয়ে উঠবে?

ঠিক আছে! জান লড়িয়ে খেলছি!

খানিক বাদে...

উঃ!

এই তো চাই!

যাক, রোভার্স খেটে খেলছে!

ডানকান ব্ল্যাকিকে...ব্ল্যাকি জিমিকে বল দিল...

গোলে মারো জিমি!

এই সুযোগ!

এই নাও!
শাবাশ রোভার্স!
গোল!
রোভার্স এখন মরিয়া হয়ে খেলছে···
রাইট উইংয়ে সরে গেছে জেরি হলওয়ে!
ওদিকে সামলাও!
কিন্তু ব্ল্যাকি গোলে শট নিয়েছে!
উঃ, দারুণ!
হাফ-টাইমে
দুটো গোলই শোধ হয়ে গেছে।
এবারে আমরা গোল করব!
কিন্তু রয়ের কী হবে?
আমিও সেই কথাই ভাবছি!
ওদিকে, রয়কে আর-এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে···
এই ঢিবিটা নতুন মনে হচ্ছে! এতেই হবে!
কে ওই লোকটা?
হতভম্ব রয় ভাবছে, এ-সব কী?
ও একজন আদিবাসী। নানান টোটকা জানে!
দেখি কী হয়!
হয়েছে!
ডাক্তার তো এখানে পাওয়া যাবে না!
কিন্তু এ-সব কী হচ্ছে?
শিগগিরই বুঝতে পারবেন!
আরে, এ কী!
এর পরে আগামী সংখ্যায়
ঢিবির ভিতর থেকে কী বেরিয়ে আসছে?

ওদিকে...
ওই তো বির খেগের জলকুণ্ড!
তাই তো!
উঃ, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে!
জল শুকিয়ে গেছে!
এগিয়ে চলো সবাই!
?
বন্দী অজ্ঞান হয়ে গেছে!
বাঁধন খুলে ওকে ফেলে দাও!
ওরে পাজি! ওরে খুনি!
তোমার কথা শুনে পথ হারালুম না তো?
না না, এটাই ঠিক পথ!
ওই দ্যাখো! মরীচিকা বোধহয়!
যা বলেছি!

টিনটিন তো বেঁচে গেল, কিন্তু
মানিকজোড় কোথায়?
আগামী সংখ্যায় আরও রহস্য!

শব্দ-সন্ধান

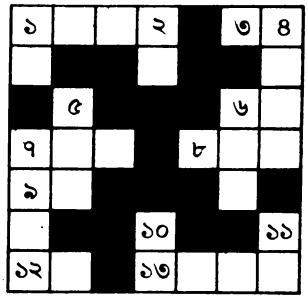

পাশাপাশি : (১) রাজা-মন্ত্রীর পরেই যাঁর কথা মনে পড়ে। (৩) চতুষ্পদ প্রাণীর সম্মুখ-পদতল। (৬) জলহস্তীর সংক্ষিপ্ত নাম। (৭) বহু পুরনো আমল বোঝাতে যে-রাজার নাম উল্লেখ করা হয়। (৮) বড় জাতের মশা। (৯) হাতি। (১২) শাস্তি। (১৩) আনন্দ-অনুষ্ঠান।

উপর-নীচ : (১) পারাপারের মাধ্যম। (২) বৃহত্তম প্রাণী। (৪) লেপ-জাতীয় শীতবস্ত্র। (৫) মহাভারতের এক নারী-চরিত্র। (৬) কৌরবরা পাণ্ডবদের যা করতেন। (৭) এক পরাজিত সম্রাট যে-প্রাণীর অধ্যবসায় দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। (১০) সুদৃশ্য গাছ। (১১) বন।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ধাঁধা

শব্দটা যে কী হতে পারে মাথায় আসছিল না। ছোট্‌কা তার আগে কটক শব্দটা দেখিয়েছিল। এপাশে ক, ওপাশে ক, মাঝখানে ট। ছোট্‌কা প্রথমে ট লিখল, তারপর বলল, দুপাশে এমন দুটো অক্ষর বসাতে হবে যাতে পুরো একটা শব্দ হয়, আবার দু-পাশে বসবে একই অক্ষর। ট-এর দুপাশে দুটো ক লিখে কটক তৈরি করল ছোট্‌কা, তারপর বলল এই রকমই আর একটা, তবে এবারের শব্দটা চার-অক্ষরের, মাঝের দুটো অক্ষর লিখে দেবে ছোট্‌কা, আমাকে দুপাশে একই অক্ষর কয়েকটা অক্ষর বসিয়ে একটা প্রচলিত ইংরেজি শব্দ তৈরি করতে হবে। বাংলায় যেমন একটাই অক্ষর দু-পাশে দু-বার বসবে বলা হয়েছে, ইংরেজিতে কিন্তু একাধিক অক্ষরের কথা বলা হল, তবে শুরুতে যে-কটা অক্ষর থাকবে এবং যা-যা থাকবে, শেষেও সেই কটা অক্ষরই পরপর তেমনভাবে থাকবে। দ্যাখো তো, শব্দটা তৈরি করতে পারো কি না। অচেনা শব্দ নয়, এটুকু বলতে পারি।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ পশু আর পাখি নিয়ে বাড়িতে চিড়িয়াখানা করেছেন এক

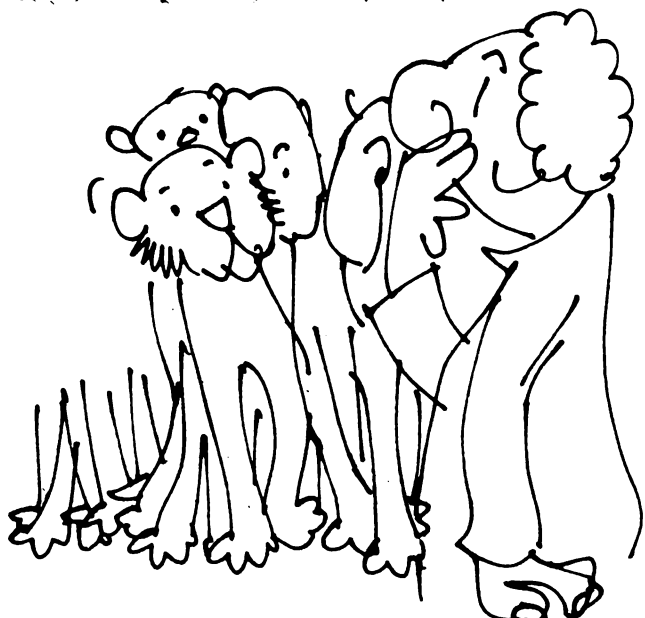

ভদ্রলোক। কটি পশু আর পাখি আছে তাঁর, এ-প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক বললেন, তিরিশটা মাথা আর একশোটা পা। এর থেকে বুঝে নিতে হবে।

বুঝলে কিছু?

গতবারের উত্তর ॥ (১) ২৮ দিনে। ২৭ দিনে উঠবে ২৭ ফুট। ২৮ দিনের দিন তিন ফুট উঠলেই তো উপরে পৌঁছে যাচ্ছে শামুকটা। (২) বাক্য হয়েছে কাব্য, ভুল হয়েছে ভূল। এই দুটো ভুলকে তিনটে বলাই হল তৃতীয় ভুল। (৩) পুষ্পকেতন।

সত্যসন্ধ

দুবার করে লিখে পুরো শব্দটা তৈরি করতে হবে।

সেই খেলাটাই খেলছি। ছোট্‌কা লিখেছে 'নোর', নোর-এর আগে-পরে একই অক্ষর বসিয়ে একটা অর্থবহ শব্দ তৈরি করতে হবে।

আমি হাল ছেড়ে বসে আছি, দ্যাখো তো, তোমরা পারো কিনা? এটাই এবারের প্রথম ধাঁধা।

এবারের দ্বিতীয় ধাঁধাটাও এইরকমই একটা শব্দ-তৈরির। তবে কিনা, প্রথমটা ছিল বাংলায়, এটা ইংরেজিতে।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ ERGRO এই পাঁচটা অক্ষরের আগে এবং পরে একইভাবে

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল মটরশুঁটির ফোটো
ফোটো: তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ কোন্ দ্বীপ জামাইদের জন্য?
উঃ জামাইকা।
প্রঃ ছেলেরা কোন্ জায়গায় বিয়ে করতে যেতে ভয় পায়?
উঃ বরপেটায়।
প্রঃ কার পেটের ওপর দাঁড়াতে বেশ লাগে?
উঃ কারপেটের ওপর।
প্রঃ কোন্ বেল খাওয়া যায় না?
উঃ মারবেল।

সুসেন

মজার খেলা

সত্যিই দারুণ মজার খেলা এটা, অথচ এই খেলার জন্য কোনো-কিছুই যোগাড় করতে হবে না, আগেভাগে তৈরি করে রাখতে হবে না কিছুই। শুধু চাই একজন বন্ধু, যাকে খেলাটা দেখাবে, আর চাই একটা কাগজ আর কলম যা-কিনা সবসময়ই রয়েছে হাতের সামনে।

নীচের ছবির মতো (নাকি রোমান হরফের মতো বলব?) একটা ছবি এঁকে বন্ধুর সামনে রাখো।

IX

তাকে এবার বলো, একটা রেখা টেনে ছবিটাকে জোড় সংখ্যা করে তুলতে হবে। সে কি পারবে?

বন্ধু একটা কেন, অনেক চেষ্টা করুক। সে আসলে এটাকে পুরোপুরিই রোমান হরফের নয় বলে ভাববে এবং সেইমতো চেষ্টা করে যাবে সংখ্যাটাকে জোড় সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে।

সে যখন হাল ছেড়ে দেবে, তখন তুমি কী করবে বলো তো? তুমি একটা রেখা টেনে নীচের মতো দেখাও—

SIX

দেখবে, বন্ধু কী-রকম হতভম্ব হয়ে গেছে। তুমি তো একটা রেখা টানতে বলেছিলে, সেটা বাঁকা হবে না সোজা, তা তো আর বলোনি। তাই এক টানে তোমার রেখাটাকে ইংরেজির এস' বানিয়ে বন্ধুকে বোকা বানাও।

দারুণ মজার খেলা এটা, তাই না?

মজারু

হাসিখুশি

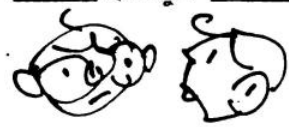

বিচারক: তুমি তা হলে স্বীকার করছ যে, ইলেকট্রিকের তার, রাস্তার লাইট, জলের পাইপ—এগুলো সব তুমিই চুরি করেছ।

আসামী: ঠিক চুরি করিনি ধর্মাবতার। পাছে আর কেউ চুরি করে ফেলে তাই ওগুলো আমার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রেখেছি।

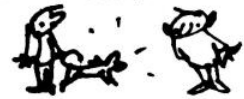

কুকুর-বিক্রেতা: এই কুকুরটা নিয়ে যান বাবু, বড় ভাল জাতের কুকুর। দামেও শস্তা আর ভারী বিশ্বাসী।

ক্রেতা: ঠিক বলছ তো? খুব বিশ্বাসী কুকুর।

কুকুর-বিক্রেতা: নির্ভয়ে নিয়ে যান বাবু। কুকুরটা এত বিশ্বাসী যে, বেচবার এক ঘন্টার মধ্যেই আবার আমার কাছে ফিরে আসে।

বাবা: বুকুন, তুমি এত খারাপ রেজাল্ট করবে, ভাবিনি। তোমার প্রোগ্রেস-রিপোর্ট আমাকে মোটেই খুশি করেনি।

বুকুন: আমার কোনো দোষ নেই বাবা। আমি মাস্টারমশাইকে রিপোর্ট পাঠাতে বার-বার বারণ করেছিলুম। তিনিই শুনলেন না।

খদ্দের: আপনি মশাই একটা যা-তা। ঝোল ফেলে আমার জামাটাই নষ্ট করে দিলেন।

হোটেলের ঠাকুর: আহ-হা, চটছেন কেন স্যার? ডালে তো জল ছাড়া আর কিছু নেই। একটু বাদেই দেখবেন হাওয়ায় সব মিলিয়ে গেছে।

ছবি অহিভূষণ মালিক

কাশীদার ফাঁসি

রঞ্জন ভাদুড়ী

কাশীদার ফাঁসির কাহিনী
জানা গেল এতদিন পরে;
ঘটনাটা ঘটেছিল নাকি
কোনো-এক টিলার উপরে।
এ-কথা তো সকলেই জানে,
ছিল তাঁর ভ্রমণের নেশা—
ঘর ছেড়ে বাহিরের ডাকে
বেরোতেন হঠাৎ হামেশা।
বয়েসটা উঠতি তখন,
বুকে ছিল অসীম সাহস,
মনে হত, ভয় পায় ভীরু
পৃথিবীটা নয় যার বশ।

একবার বাইসাইকেলে
পৌঁছে গেলেন তিনি ঘানা,
তাঁকে পেয়ে সে-দেশের লোক
আহ্লাদে হল আটখানা।
সেখানে কাটিয়ে কিছুকাল
একদিন চাপেন বিমানে।
পৃথিবীর দুর্গম এলাকা
তাঁকে যেন ডাকে কানে-কানে।
রাত বাড়ে, ঘুমে ঢুলুঢুলু
যাত্রীদের সবাকার চোখ।
কাশীদার চোখে নেই ঘুম—
চাপে এক নিদারুণ রোখ।
ধাবমান এরোপ্লেন থেকে
প্যারাশুটে দেন তিনি ঝাঁপ,
ধীরে-ধীরে নীচে নেমে যান—
যেন এক ফণাতোলা সাপ।
তারা জ্বলে মাথার উপরে
চোখ যায় নীচে যত দূর,
মিশকালো অন্ধকার মেখে
পৃথিবী নিঝুম যমপুর।

অবশেষে পায়ে ঠেকে মাটি,
অনুমিত হয় সেটি টিলা,
গাছপালা বিরল সেখানে—
হয়তো-বা গ্রানাইট-শিলা।
অদূরেই অরণ্য গভীর
দেখা যায় সিল্যুটের মতো।
হঠাৎ সেখানে জ্বলে ওঠে
মশালের আলো শত-শত।
সেই আলো অগ্রসর হয়
স্থাণুবৎ কাশীদার দিকে।
যতই এগিয়ে আসে কাছে
অন্ধকার হতে থাকে ফিকে।
ঘটনাটা পরিষ্কার হয়—
কাশীদার বিস্ফারিত চোখ—
পাহাড়ের সানুদেশে এসে
দল বেঁধে বেঁটে সব লোক
তরতর করে উঠে আসে
টিলার খাড়াই বেয়ে-বেয়ে।
মাপে খাটো, ক্ষিপ্রতায় নয়,
দ্রুতগামী বানরের চেয়ে।
টিলার মাথায় উঠে এসে
কাশীদাকে ঘিরে ধরে তারা।
কথা বলে দুর্বোধ ভাষায়,
কেউ করে অদ্ভুত ইশারা।
এরা কি পিগমি, বুশম্যান?
না কি এরা সেই বামবুটি?

কাশীদা ভাবেন মনে-মনে,
মুখে ফোটে চিন্তার ভ্রুকুটি।
টিলাটা কি নিষিদ্ধ এলাকা?
এখানে কি আছে কোনো 'টাবু'?...
পিছমোড়া ক'রে হাত বেঁধে
কাশীদাকে করে তারা কাবু।
তারপর আঁকাবাঁকা পথে
তাঁকে নিয়ে চলে যায় তারা,
থামে এক গুহামুখে গিয়ে—
চারি পাশে নীরন্ধ্র পাহারা।
জ্বলন্ত মশাল হাতে নিয়ে
দুজন গুহায় ঢুকে পড়ে,
কাশীদাকে ঠেলে দেওয়া হয়
রাক্ষুসে পাথুরে সেই ঘরে।
ভিতরের দৃশ্যাবলি দেখে
কাশীদার চোখ ছানাবড়া—
সেখানে ফাঁসির আয়োজন,
উপরে ঝুলছে দড়িদড়া।
অনুমানে বোঝেন কাশীদা
হয়ে গেছে ফাঁসির হুকুম।
নানা দেশ ঢুঁড়ে শেষকালে
এইখানে হতে হবে গুম?
ফাঁসিকাঠে তোলা হল তাঁকে,
গলায় পরানো হল ফাঁস,
নিমেষে ঝোঝুল্যমান দেহ—
বন্ধ হয়ে আসে বুঝি শ্বাস।
কিন্তু তিনি প্রাণায়ামে পটু,
ফুলিয়ে গলার মাংসপেশী
শূন্যে ঝোলেন স্থির হয়ে।
কেটে যায় প্রহরেরও বেশি।
ফাঁসুড়েরা চলে গেল সব,
কাশীদাকে ভেবে গেল মৃত।
তখন কাশীদা তাঁর কাজে
নিজেকে করেন নিয়োজিত।
হাতে ছিল অঙ্গুরীয়, সেটা
অক্সি-অ্যাসিটিলিন-আধার,
কাশীদা টেপেন তার চাবি,
আলোকিত হয় চারি ধার।
অক্সি-অ্যাসিটিলিনের তাপে
ছিঁড়ে যায় হাতের বাঁধন,
তখন দু'হাতে দড়ি ধরে
অনায়াসে ফাঁসমুক্ত হন।
দড়িতে বিষম দোল খেয়ে
পায়ে পান দাঁড়াবার ঠাঁই,
গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন।
অন্ধকার করে যাই-যাই
ততক্ষণে। দূর-দিগ্বলয়ে
ফুটি-ফুটি করে যেন আলো—
কোন্-সে অলক্ষ্য তুলিকর
ফিকে নীলে মুছে দেয় কালো।

উপজাতিদের রীতিনীতি
বোঝা ভার, তবু মনে হয়
ফাঁসিকাঠে বেঁচে গেলে কেউ
কদাপি সে বধযোগ্য নয়।
নইলে আবার তাঁকে ধরে
কেনই বা দিল তারা ছেড়ে!
আমার এ-অনুমানে সায়
কাশীদা দিলেন মাথা নেড়ে।

ছবি দেবাশিস দেব

আপনার শিশুর সেরা সুরক্ষা

Duckback®
চিলড্রেনস্ রেণওয়্যার

রাবার-শিল্পে ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতা

বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ
ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ

naa RW 2A Ben

খৈরি নামে হীরে

খৈরি নদীর তীরে
খৈরি নামে হীরে,
লোকালয়ে মানুষ হল—
বন্ধু হল ধীরে।
ব্যাঘ্রশিশু বড় হয়
শত্রু তার কেউ যে নয়,
প্রাণের দোসর হরিণ—
কত কথাই কয়।

না বলে সে গেল চলে
নয়ন ভরে আসে জলে।

নন্দিনী ভট্টাচার্য (বয়স ১৫)

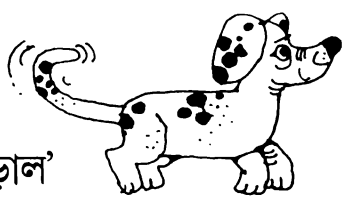

'কুড়াল'

একটি বিড়ালের বাড়ি ছিল বটতলা এবং একটি কুকুরের বাড়ি ছিল নিমতলা। বিড়ালের ঘরে তিনজন থাকে, বিড়াল, বিড়ালনি আর তাদের মেয়ে পম্পা।

কুকুরদেরও তিনজন—কুকুর, কুকুরনি ও তাদের ছেলে সুদর্শন। কুকুর চাকরি করে বটতলাতেই।

একবার বিড়ালকে অফিসের কাজে যেতে হল নিমতলা। সবাইকে সঙ্গে নিয়েই গেল। কারণ, অনেকদিন সেখানে থাকতে হবে। সেখানে কুকুরের ছেলের সঙ্গে বিড়ালের মেয়ের খুব ভাব হয়ে গেল। তারা দু'জনে খেলত। আস্তে আস্তে তারা বড় হল। তখন সুদর্শন ও পম্পার বিয়ে হয়ে গেল। সুদর্শন চাকরি পেয়ে গেল। বিড়াল আর বিড়ালনি ফিরে গেল বটতলা। পম্পা তার শ্বশুরবাড়িতে থেকে গেল। এক বছর পরে তার ছেলে হল। তার নাম 'কুড়াল'।

ঈশিতা অধিকারী (বয়স ৯)

হয়ে গেল

কাঁচিতে নেই ধার
হয়ে গেল হার
হারে নেই লকেট
হয়ে গেল পকেট
পকেটে নেই টাকা
হয়ে গেল ঢাকা
ঢাকাতে নেই মানুষ
হয়ে গেল ফানুস

পারমিতা দাস (বয়স ৯)

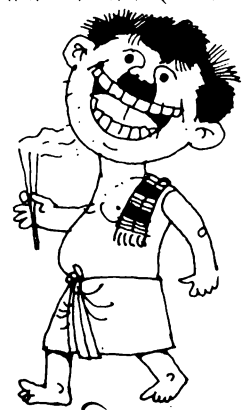

বোকা আর বিচ্ছু

মনোহর হাঁসদা বিখ্যাত বোকাটি
ভুলে গিয়ে বাথরুমে নিয়ে যায় ধূপকাঠি।
সবাই বলি, "ভাই!
করো নাকো আইঢাই"
দাঁতগুলো বের হয় বত্রিশপাটি।

বঙ্কুবাবুর বিচ্ছু ছেলে ওড়ায় খালি ফানুস—
তাই দেখে যে বঙ্কু বলে, "হচ্ছিস না মানুষ?"
শুনেই বিচ্ছু কাঁদতে বসে
চড় লাগাল বঙ্কু কষে
অমনি মোদের বিচ্ছুবাবু হয়ে গেল মানুষ।

সৌমিক নন্দীমজুমদার (বয়স ১৩)

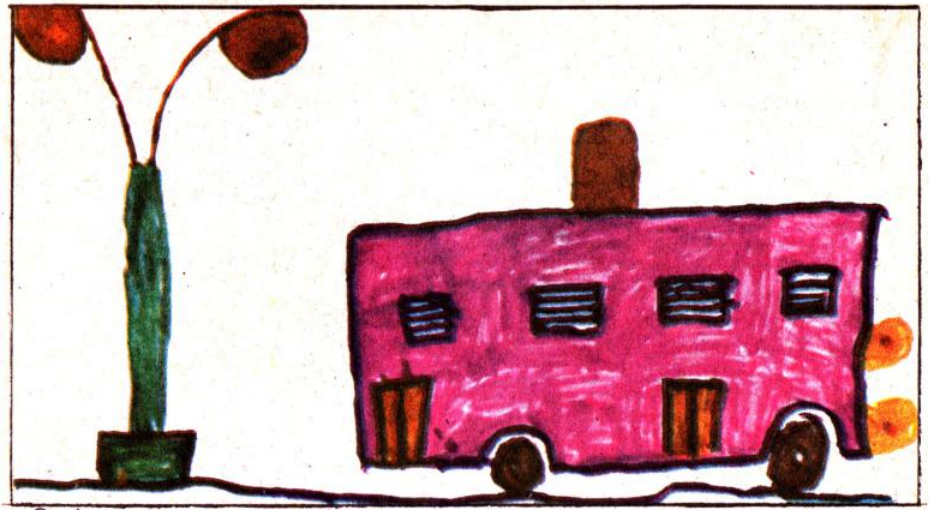

ছবি এঁকেছে : কল্লোল রায় (বয়স ৬)

ছবি এঁকেছে : টিটো সাহা (বয়স ৬)

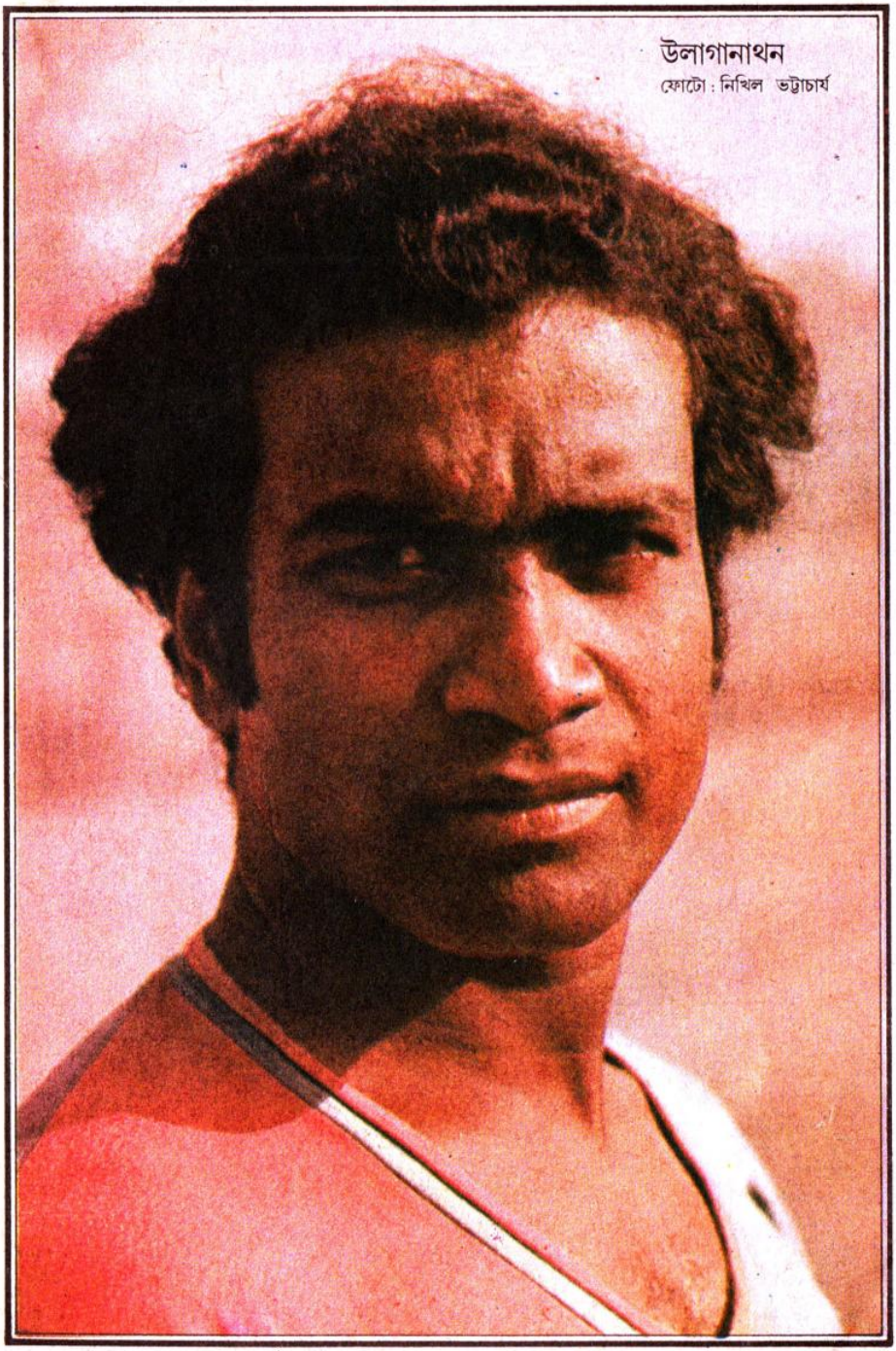

উলাগানাথন

ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

মোহনবাগানের কোচ

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

কোন্‌টা শঙ্কর ব্যানার্জি রে?

মোহনবাগান মাঠে বসে অনুশীলন দেখছিলাম। কথাটা শুনে পেছন ফিরে দেখলাম। কয়েকটি দশ-বারো বছরের ছেলে দেরিতে মাঠে এসেছে। দুটি দল করে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলা হচ্ছে, মাঠের আধখানা এলাকায়। একটি দলে কোচ শঙ্কর ব্যানার্জি খেলছেন, কিন্তু যারা তাঁকে চেনে না তাদের পক্ষে চিনে ওঠা মুশকিল। এই বয়সে (জন্ম ১৯ মাঘ ১৩৫১) তিনি সদ্য ফেডারেশন কাপ-জয়ী মোহনবাগান-খেলোয়াড়দের সঙ্গে কী-রকম সমান তালে খেলেন, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শঙ্কর অবশ্য প্রথম ডিভিসনে এখনও খেলেন। গতবার টালিগঞ্জ অগ্রগামীর হয়ে বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলেছেন। আর এবারও যদি ওদের তেমন প্রয়োজন হয় শঙ্করকে নামতে হতে পারে।

ওই ছেলেগুলির জানার কথা নয়, মোহনবাগানের কোচ হবার আগে শঙ্কর মোহনবাগানে সাত বছর খেলেছেন (১৯৭১-৭৭), এক বছর (১৯৭০) ইস্টবেঙ্গলে। তার চাইতে বড় কথা, প্রি-অলিমপিকসে (১৯৭২) এবং মারা হালিম প্রতিযোগিতায় (১৯৭৫) ভারতের হয়ে খেলেছেন। দ্বিতীয় প্রতিযোগিতাটিতে খেলা বিশেষ কৃতিত্বের, কারণ তার দু'বছর আগে ইস্টবেঙ্গলের সুভাষ ভৌমিকের সঙ্গে এক সংঘর্ষে শঙ্কর সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। সকলে ধরেই নিয়েছিল যে ওইখানেই তাঁর ফুটবল-জীবনের ইতি। কিন্তু অসাধারণ ধৈর্য, আত্মপ্রত্যয় ও সম্ভবত কিছুটা সৌভাগ্যের জোরে শঙ্কর আবার স্বস্থানে উঠে এসেছিলেন।

সে-কথা যাক। আজ বাটানগরের স্বর্গত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ও একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বি-বা-দী বাগ শাখার কর্মী শঙ্করের প্রধান পরিচয়, তিনি ভারতীয় ফুটবলের রাজসম্মান-বিজয়ী মোহনবাগানের প্রশিক্ষক। যাঁরা তাঁকে চেনেন না, তাঁরা চিনতে চেষ্টা করছেন। আর, যাঁরা চেনেন তাঁরা নতুন করে তাঁর মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছেন।

আমিও চেষ্টা করছিলাম, তবে একটু অন্যরকমভাবে। কথা বলার ফাঁকে-ফাঁকে লক্ষ করছিলাম, আট-দশ বছর আগের সেই মৃদুভাষী খেলোয়াড়টির কোনও পরিবর্তন হয়েছে কি না। মুখের কোথাও একটু অহমিকার ছাপ, একটু 'আমি ফেডারেশন কাপ আনলাম' ধরনের ভাব দেখা যাচ্ছে কিনা। না, সে-রকম কিছুই নেই। শঙ্কর সেই আগের মাটির মানুষটিই আছেন। বরং তিনি নিজে মোহনবাগানের ছেলেদের সতর্ক করে দিয়েছেন—ফেডারেশন কাপ পেয়েছ, ভাল কথা। তবে কলকাতার লীগ ও শীল্ড কিন্তু আলাদা ব্যাপার।

ফেডারেশন কাপে সাফল্যের রহস্য? কিছুই নয়—এক অদৃষ্টপূর্ব 'টীম স্পিরিট' গোটা দলটিকে চালিত করেছে। মাঠের ভেতরে ও বাইরে প্রত্যেকটি খেলোয়াড় অপরকে সাহায্য করেছে। খেলার আগে, বিরতিতে ও পরে প্রত্যেকে অপরের সঙ্গে আলোচনা করেছে নিজের খেলার খুঁত বা ঘাটতি এবং তার প্রতিকার নিয়ে। আর অন্তত দুটি খেলায় 'আজ জিততেই হবে' মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা মাঠে নেমেছিল। হ্যাঁ, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডানের বিরুদ্ধে।

বললাম, তৃতীয় দল হয়েও চ্যাম্পিয়ন হওয়া...।

মোহনবাগানের ডিফেণ্ডার শঙ্কর যেমনভাবে বিপক্ষ ফরোয়ার্ডদের পা থেকে চিলের মতো ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে লম্বা ক্লিয়ারেন্স করে বল বিপদসীমার বাইরে পাঠিয়ে দিতেন, ঠিক সেইরকমই আমার মুখের কথাটি কেড়ে নিয়ে উড়িয়ে দিলেন প্রশিক্ষক শঙ্কর। বললেন, থার্ড টীমের ধারণাটাই ভুল। কাগজে-কলমে কী টীম হল সেটাই তো বড় কথা নয়। আসল ব্যাপারটা তো মাঠে। আর বড় তিন দলের মধ্যে আমার ডিফেন্সই তো সেরা, তাহলে তাকে থার্ড টীম বলা যায় কী করে?

মাদরাজে কোনও সময়ই শঙ্কর 'ফেডারেশন

কাপ জিতছি' বা 'জিতে গেছি' রোগে ভোগেননি। ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়েও না। শেষ না দেখে আগে থেকেই নাচা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অকপটে স্বীকার করলেন, প্রথম দিকে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনাল লীগে তিনি কিছুটা নার্ভাস ছিলেন। কিন্তু তিনটি খেলার পরে তিনি দলের দোষত্রুটি বুঝে সেইমতো ব্যবস্থা নিতে পেরেছিলেন।

"ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সে মনোরঞ্জন ছাড়া বাকিরা, বিশেষ করে দুই সাইড ব্যাক দুর্বল। তাই দুই উইংকে বলেছিলাম ঐ দুর্বলতার সুযোগ তারা কীভাবে নেবে। মনোরঞ্জনের পাশে সুধীর খেললে অবশ্য আলাদা কথা। মাঝ-মাঠে আমার অভিজ্ঞ, সিনিয়র দুই খেলোয়াড়। সে-জায়গায় ইস্টবেঙ্গলের দুজন তরুণ হলেও এখনও তারা দলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। আর ওদের ফরোয়ার্ড লাইন চমৎকার, তবে বাঁ দিকটা বাদে। আমি ছেলেদের এইসব কথা বলে কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

মজিদের কথা উঠল। শঙ্কর বললেন, "ওর সম্পর্কে আমি একটুও বিশেষ নির্দেশ দিইনি। 'বিশেষ' কোনও নজর দিতে গেলে তা থেকে একটা 'মজিদ - ফোবিয়া' তৈরি হয়ে গোটা টীমটার খেলাই নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে মজিদ যার কাছে যখন যাবে সে-ই তার ব্যবস্থা করবে—এটাই ভাল। আর একটা কথা, মজিদ যখন বল ধরে, মাঠের সেইদিকটায় এমনিতেই দু'দলের খেলোয়াড় মিলে জটলা হয়ে যায়। তা ছাড়া অধিকাংশ সময়ই জামশিদের হেড-করা বলগুলো মজিদ নেয়। দেখলাম, জামশিদকে যদি হেড করতে না দিই তা হলেই তো গোড়া মেরে দেওয়া যায়। লাগিয়ে দিলাম আমার দুই লম্বা স্টপারকে।"

"মহামেডানের কোন্ দুর্বলতা কাজে লাগালেন?"

"মহামেডানের ডিফেন্সে চিন্ময় ছাড়া বাকি তিনজন জুনিয়ার। তাই বুঝেছিলাম, ফরোয়ার্ডরা ঐ তিনজনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারলেই খেলায় আমাদের আধিপত্য বজায় থাকবে।"

ফেডারেশন কাপে মোহনবাগানের সাফল্যের পর শঙ্কর অভিনন্দনের বন্যায়

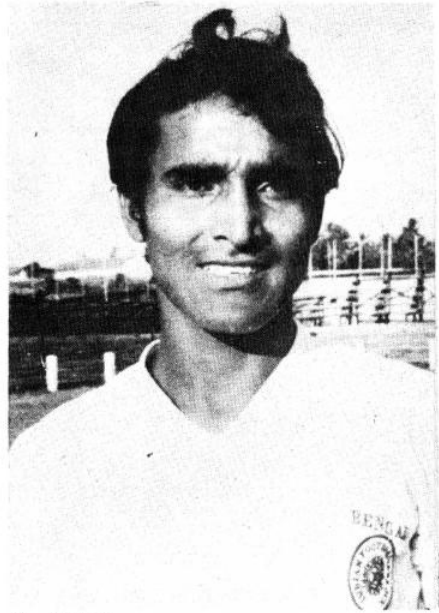

টীম স্পিরিটই আমাদের সাফল্য এনেছে

আত্মবিস্মৃত হননি। আসলে, বড় দলের প্রশিক্ষক হবেন, এমন চিন্তা গোড়াতে কোনওদিনই করেননি। তাই শৈলেন মান্না ও ধীরেন দে-র প্রস্তাব নিয়ে যখন মোহনবাগানের হারুদা তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখন শঙ্কর সম্ভবত কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। বলা বাহুল্য, সেটা সাময়িক।

আর আজ মোহনবাগানের নাগজি ও ফেডারেশন বিজয়ের পর শঙ্কর ষোল বছর আগে বাটার হয়ে কলকাতার ফার্স্ট ডিভিসনে প্রথম খেলার কিংবা পরে হাওড়া ইউনিয়ন, স্পোর্টিং ইউনিয়ন বা ইস্টার্ন রেলের খেলার সময়ের সেই শঙ্করই রয়ে গেছেন। প্রদীপ ব্যানার্জির পরম ভক্ত মানুষটিকে মাঠে ভিড়ের মধ্যে চেনা যেত শুধু খেলার জন্যে। আজও দশটা-পাঁচটার অফিসমুখো জনতার মাঝখানে হঠাৎ তাঁকে চিনতে পারার কথা নয়—চেহারায় তিনি একেবারে নিপাট করণিক।

তবে মোহনবাগানের আরও সাফল্য এলে 'কোন্‌টা শঙ্কর ব্যানার্জি' এই প্রশ্ন করার লোক ক্রমেই কমে আসবে। মনে হয় শঙ্কর সেই সাফল্য আনতে পারবেন। কারণ তিনি জানেন, ফেডারেশন কাপই শেষ নয়। শুরু।

বাঁ-হাতি একাদশ

অশোক রায়

'যদিও ডান-হাতিদের হৈ-হৈ করে ওঠার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না তবু মেনে নিতেই হবে ক্রিকেটে যারা ন্যাটা অর্থাৎ বাঁ-হাতি তাদের কদর একটু বেশি।' কথাটা ইংল্যাণ্ডের সব-সেরা ক্রিকেট কোচ আল্‌ফ গোভারের।

বোধহয় বাঁ-হাতিদের সংখ্যা তুলনায় কম বলে তাদের বিরুদ্ধে বল করার বা তাদের বলে খেলার তেমন সুযোগ হয় না ডান-হাতি ক্রিকেটারদের। সেই কারণেই কোনো দলে ন্যাটা খেলোয়াড় বেশি থাকলে বিপক্ষের অসুবিধেটাও বাড়ে।

জানি, এখনও কিছু 'ডান'পন্থী প্রতিবাদী কণ্ঠে রঞ্জি, ব্র্যাডম্যান, হ্যামন্‌ড, লিলি, লিণ্ডওয়ালদের নামগুলো পাক খাচ্ছে। ঠিক আছে, তোমাদের ফেভারিট 'রাইট-হ্যাণ্ডারস্‌ ইলেভেনের' বিরুদ্ধে খেলার জন্যে একটা জবরদস্ত 'লেফ্‌ট-হ্যাণ্ডারস্‌ ইলেভেন' গড়ে ফেলা যাক।

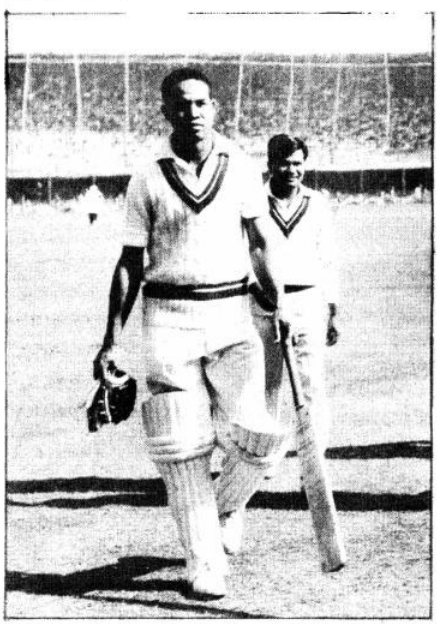

অধিনায়ক হবেন গ্যারি সোবার্স

প্রত্যেকেই খুশি হবে যদি বাঁ-হাতি একাদশের অধিনায়ক হিসেবে গ্যারি সোবার্সকে মাঠে নামতে দেখি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই বিখ্যাত অলরাউণ্ডারটি ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্‌ডিংয়ের প্রতিটি বিভাগকেই সমৃদ্ধ করেছেন ৮০৩২ রান (বিশ্বরেকর্ড), ২৩৫টি উইকেট, ১১০টি ক্যাচ নিয়ে। পাকিস্তানের বিপক্ষে তাঁর ৩৬৫ নট আউট ইনিংসটিও টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ কীর্তি। এই টীমে সোবার্স বোলিংয়ে ওপেন করলেও ব্যাট করবেন সাত নম্বরে।

ব্যাটিংয়ে ওপেন করার দায়িত্বে থাকবেন দুই অভিজ্ঞ অস্ট্রেলিয়ান—আর্থার মরিস (১২টি টেস্ট সেঞ্চুরি) এবং বিল লরি (১৩টি টেস্ট সেঞ্চুরি)। ওয়ান-ডাউন জায়গাটি ২১টি সেঞ্চুরিওয়ালা নীল হার্ভেকে ছেড়ে দিতে কারুর আপত্তি থাকার কথা নয়। ব্র্যাডম্যানের পর অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের সর্বাধিক মোট রানের নজিরটিও হার্ভের। ইংল্যাণ্ডের জন এডরিচ, নিউজিল্যাণ্ডের বার্ট সাটক্লিফ এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অ্যালভিন কালীচরণের মধ্যে যে-কোনো একজন আসবেন টু-ডাউনে। এডরিচের টেস্টে ৫২টি বাউণ্ডারি মারার বিশ্বরেকর্ডসহ ট্রিপল সেঞ্চুরি এবং হাজার-পাঁচেক রান আছে। কালীচরণ ভাল 'হুকার'। টেস্টে বার-আটেক নব্বুইয়ের ঘরে আউট হলেও তাঁর ঝুলিতে আছে হাজার-চারেক রান। রানের পুঁজি কম হলেও ইনিংস গড়ার কাজে সাটক্লিফ নির্ভরশীল। তবে সব মিলিয়ে এডরিচের নির্বাচনেই নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার গ্রীমি পোলককে দলে নেওয়া এবং পাঁচ নম্বরে নামাবার একটিমাত্র উদ্দেশ্য—তাঁর মারকুটে ব্যাটটিকে কাজে লাগানো। ডান-হাতি ভিভ রিচার্ডসের পাল্‌টা জবাব দেবার লোক নিঃসন্দেহে গ্রীমি পোলক। রাজনৈতিক কারণে টেস্ট-জীবন সংক্ষিপ্ত না হলে পোলকের আগুনে-ব্যাট রানের আরও ফুলঝুরি জ্বালত।

এখনকার দর্শকদের কথা ভেবেই আরও দুজন 'হার্ড-হিটার' দলে থাকছেন। লিফ্‌টিং শটে ইংল্যাণ্ডের ফ্রাঙ্ক উলি ছিলেন মাস্টার। কাউণ্টি ক্রিকেটে ২৮ বার হাজার রান পূর্ণ করা

এবং ৯১৩টি ক্যাচ ধরার রেকর্ড দুটি উলির পক্ষে রয়েছে।

আর একজন—চশমাধারী লয়েড, যিনি ভীষণ জোরে বল মারতে বড্ড ভালবাসেন। পাঁচ হাজার রান এবং একটানা টেস্টে অবতীর্ণ হবার রেকর্ড ছাড়াও কভার পয়েন্টে তাঁর ক্ষিপ্রতাকে সমীহ করা হয় 'সুপার ক্যাট' নামের মধ্যে। ব্যাটিং-অর্ডারে লয়েড, সোবার্স, উলি আসবেন যথাক্রমে ছয়, সাত, আট নম্বরে।

একজন অলরাউণ্ডার নির্বাচনের প্রশ্নে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান ডেভিডসন, ইংল্যাণ্ডের উইলফ্রেড রোডস এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রেভর গডার্ডের মধ্যে জোর প্রতিযোগিতা হবে। ডেভিডসনের সংগ্রহে ১৩২৮ রান ১৮৬ উইকেট, গডার্ডের ঝুলিতে ২৫১৬ রান ১২৩ উইকেট থাকলেও রোডসের কৃতিত্বের নজির বেশি। ক্রিকেট কেরিয়ারে ৪১৮৭টি উইকেট নেওয়া এই স্পিনারের ব্যাটের হাতও মন্দ নয়। 'ডাবল' অর্থাৎ হাজার রান এবং একশ উইকেট পেয়েছেন ১৬ বার। এ ছাড়া টেস্টে 'এক থেকে এগারো' নম্বরে ব্যাট করতে নামার এক অত্যাশ্চর্য বিশ্বরেকর্ডও রয়েছে তাঁর দখলে (এ-দৃষ্টান্তের অন্য অংশীদার ভারতের ভিনু মাঁকড়)। তবু ডেভিডসনই দলে থাকবেন পেস-অ্যাটাক জোরদার করতে।

বাঁ-হাতি ব্যাট করেন এমন উইকেটকীপার একজনই—অস্ট্রেলিয়ার রড্‌নি মার্শ। স্পিনার হিসেবে ইংল্যাণ্ডের ডেরেক আণ্ডারউড এবং ভারতের বিষেণ বেদীর মধ্যে কে দলে আসবেন সেটা নির্ভর করবে পিচের অবস্থা এবং

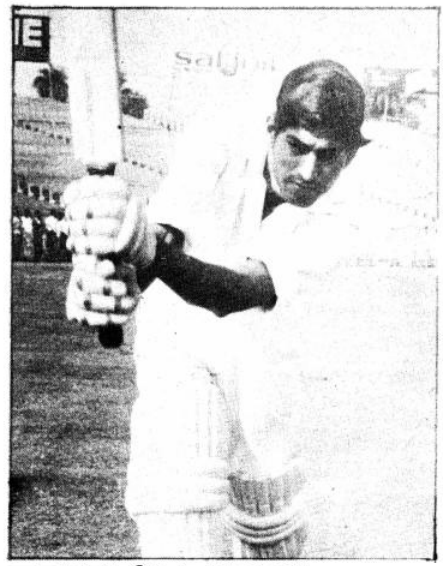

সম্ভাব্য 'দ্বাদশ-ব্যক্তি' একনাথ সোলকার

আবহাওয়ার ওপর। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলে আণ্ডারউড ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারেন। সবশেষে, কিছু অবিশ্বাস্য ক্যাচের কথা ভোলা যাবে না বলেই 'দ্বাদশ-ব্যক্তি' নির্বাচনে ইংল্যাণ্ডের টাকমাথা টনি লকের পরিবর্তে আসবেন ভারতের একনাথ সোলকার।

ইতিমধ্যে 'ডান-হাতি একাদশ' যদি গড়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ভাবতে থাকো ম্যাচের রেজাল্ট কী হবে! তবে একটা কথা বলে রাখি—টসের ব্যাপারে সোবার্সের ২৭ বার জয়ের রেকর্ড থাকায় মনে হয় প্রথম ব্যাট করার সুযোগ পাবে বাঁ-হাতি একাদশই।

শান্তিপুরের এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারে আশানন্দের জন্ম। লম্বা-চওড়া চেহারা, গায়ে অসম্ভব জোর। কারও সাতে-পাঁচে থাকে না সে, নিজের কিছু জমিজমা আছে, তাইতেই চলে যায়। একবার কী-একটা কাজে আশানন্দকে দূর-দেশে যেতে হয়েছে। ফেরবার পথে রাত হয়ে যাওয়ায় এক ধনী গৃহস্থবাড়িতে আশ্রয় নিতে হল। আর সে-রাতেই সে-বাড়িতে ডাকাত পড়ল। ডাকাতের নাম শুনেই বাড়ির লোকেরা পেছনের দরজা দিয়ে পালাতে লাগল। বাড়ির কর্তার হঠাৎ খেয়াল হওয়াতে দৌড়ে গিয়ে অতিথিকে জাগিয়ে বললেন, "শিগগির পালাই চলুন, ডাকাত পড়েছে।" আশানন্দ চোখ কচলাতে কচলাতে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিল প্রথমে, তারপর মালকোঁচা মেরে, কাছাকাছি কোনো হাতিয়ার না পেয়ে ঢেঁকির-ঘরে ছুটে গিয়ে পেল্লায় ঢেঁকিটি উপড়ে নিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ল ডাকাতদের সামনে। ঢেঁকি ঘুরিয়ে মারতেই দু-তিনটে জখম, আর বাকিগুলোর প্রাণভয়ে পলায়ন। সেই থেকে আশানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নাম হয়ে গেল আশানন্দ ঢেঁকি।

ফরহ্যান্স—দাঁতের ডাক্তারের তৈরী টুথপেষ্ট

দাঁত সাফ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার মাড়ি মজবুত করতে সাহায্য করে

মাড়ির গোলমাল হলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে

দাঁতের ডাক্তাররা বলেন, দাঁত ঠিক মত সাফ না করলে প্লাক নামে জীবাণুর যে পাতলা পর্দা আপনার দাঁত আর মাড়িতে সবসময়ই জড়িয়ে থাকে, তা জমে ওঠে। এই প্লাক দন্তমলে পরিণত হয়ে মাড়ি দুর্বল ক'রে ঠেলে দেয়, ফলে এমন কি সুস্থ দাঁতও পড়ে যেতে পারে। মাড়ির গোলমাল সাধারণ স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি করতে পারে।

ফরহ্যান্স মাড়ি রক্ষা করে

ডাঃ ফরহ্যান্সের শক্তিশালী অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট ক্রিয়ার অদ্বিতীয় ফরমুলা আপনার মাড়ি মজবুত করে তোলে, ফলে আপনি মাড়ির গোলমাল রোধ করতে পারেন। কাজেই, আপনার দাঁত ব্রাশ আর মাড়ি মালিশ করুন, ফরহ্যান্স টুথপেষ্ট আর ফরহ্যান্স ডবল অ্যাকশন টুথব্রাশ দিয়ে।

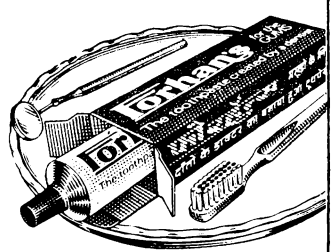

ফরহ্যান্স — মাড়ির জন্যে

Regd. T.M: Geoffrey Manners & Co. Ltd.

251F-172 BEN

গল্পের গোরু

শ্যামলকান্তি দাশ

এক যে গল্প আছে,
গল্পের গোরু
একবার মোটা হয়
একবার সরু।

একবার কার যেন
ধুলো দিয়ে চোখে,
গল্পে পড়েছে ঢুকে
খেয়ালের ঝোঁকে।

তারপর থেকে সে কি
ঘাস খায় মাঠে?
ভেবে-ভেবে বকুদার
দিনরাত কাটে।

রেগে গেলে ঠ্যাং ছোঁড়ে?
শিঙ নাড়ে নাকি?
অথবা সে-গল্পের
পুরোটাই ফাঁকি।

ভেবে-ভেবে বকুদার
ঘুম পায়, আর
তছনছ হয়ে যায়
ঘর-সংসার।

তারপর কী যে হল
জানা নেই কারও,
নিশ্চয়ই গোরুটির
কথা আছে আরও।

বকুদার নোটবইয়ে
বিবরণ আছে,
গল্পের গোরু নাকি
উঠেছিল গাছে!

ছবি দেবাশিস দেব

ভোরের অ্যালার্ম

সাধনা মুখোপাধ্যায়

রোজ ভোর পাঁচটায় কিরিরিং কিরিরিং করে অ্যালার্ম ঘড়িটা বেজে ওঠে। মা বিছানা ছেড়ে উঠে যান আর টুকুনেরও ঘুমটা ভেঙে যায়। টুকুন কিন্তু শুয়েই থাকে। তখনও বাইরে আবছা-আবছা অন্ধকার। একটু শীত-শীত করে। টুকুন চাদরটা ভাল করে টেনে নেয়। এখন এক ঘণ্টা চুপচাপ শুয়ে থাকা। ঠিক ছটার সময় মা ডাকবেন, "টুকুন,উঠে পড়ো। ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে।" সাতটার সময় বড় রাস্তার মোড়ে স্কুলের বাস এসে যায়। টুকুন তৈরি হয়ে মস্ত বড় ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে আগে থেকেই গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

শুয়ে থাকতে থাকতেই মনে হল আজ সে প্রথম জন্মদিনে বাবার কিনে দেওয়া ফুটবলটা নিয়ে খেলার মাঠে যাবে। ছোট্টু, রাজু, কিটুন সকলেই খুব উৎসাহ নিয়ে অপেক্ষা করবে তার জন্যে। ওদের একটা ভাল ফুটবলের বড় অভাব। খেলা অবশ্য ওরা খুব ভাল করে জানে না। দুটো দলে ভাগ হয়ে গিয়ে কষে বল পেটায়। দৌড়োদৌড়ি করতে করতে সারা গা ঘামে ভিজে যায়, হাঁপিয়ে পড়ে ওরা। তারপর বিশ্রাম নিতে মাঠে একটুখানি বসে নানারকম গল্প করতে থাকে—স্কুলের গল্প, বাড়ির গল্প। তারপর গুটি গুটি পায়ে বাড়ি ফেরা। মনে হয় আরেকটু খেলতে পারলে বেশ হত। যদিও স্কুল থেকে এসে একপ্রস্থ ভাত খাওয়া এবং আরেক প্রস্থ জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে তবুও প্রচণ্ড খিদে পেয়ে যায় টুকুনের । ভাল করে হাত-পা-মুখ ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছে রান্নাঘরে চলে আসে সে। মা বলেন, "কী, খেলা শেষ হল? যাও এবারে পড়তে বোসো। মন দিয়ে হোম-টাস্কগুলো করে নাও। যা বুঝতে পারবে না আমাকে জিজ্ঞেস কোরো।"

মায়ের কথা শেষ হয়ে গেলেও টুকুন সেখান থেকে নড়ে না। মা টুকুনের খিদে পাওয়ার কথা ঠিক বুঝতে পেরে যান, ফিক করে হেসে ফেলেন। বলেন, "মুড়ি-পেঁয়াজ খাবি? দাঁড়া তেল দিয়ে মেখে দিচ্ছি।" মা রাত্তিরের কুটনো কোটা ছেড়ে মুড়ি মাখতে বসেন। মুড়ি-মাখার সঙ্গে এক টুকরো আমের আচার দিতেও ভোলেন না। টুকুন মুড়ির বাটিটা নিয়ে পড়ার টেবিলে যায়। বাবার অফিস থেকে ফিরতে দেরি হয়। টুকুনের ততক্ষণে ঢুলুনি এসে যায়। মা খেতে ডাকেন। কোনোরকমে চোখে-মুখে জল দিয়ে খেতে বসে যায় টুকুন। বাবা হাসতে হাসতে বললেন, "কী টুকুন, খুব ঘুম পাচ্ছে? মাকে খাইয়ে দিতে বলব?" বাবা যে কী বলেন—টুকুনের দশ বছর বয়েস হতে চলল।

বন্ধুদের সামনে এরকম কথা বললে ওরা খুব খ্যাপাবে ওকে।

খেলার মাঠে ফুটবলটা নিয়ে গিয়ে যেই পা দিয়ে প্রথম কিকটা মেরেছে টুকুন অমনি মা ডেকে উঠলেন, "টুকুন আর ঘুমিও না। উঠে পড়ো। ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে।" টুকুন চোখ ঘষতে ঘষতে ধড়মড় করে উঠে বসে। ধুত! এতক্ষণ কি শুধু স্বপ্নই দেখছিল সে। আচ্ছা, এমন একদিন হয় না—যেদিন তাড়াতাড়ি উঠতে হবে না—যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমোতে পারবে টুকুন। রবিবার ছুটির দিন, কিন্তু সেদিনও ভোরে উঠতে হয় টুকুনকে। ছবি আঁকার ক্লাসে যেতে হয়। মাঝে মাঝে একটু জ্বর হলেও তো পারে—তাহলে বেলা অবধি শুয়ে থাকবে টুকুন। সত্যি, টুকুন মনে মনে বলে, কয়েকদিন একটু জ্বর হলে ভাল হয়। বেশ মজা করে অনেকক্ষণ ঘুমোবে সে।

স্কুল থেকে ফিরতে বেলা দেড়টা-দুটো হয়ে যায়। জামা-কাপড় ছেড়ে ভাত খাওয়ার পরই পাশের বাড়ির সলটু এসে যায়। হাতে তার লুডো আর সাপ-লুডোর ছক। জিজ্ঞেস করে, "খেলবি?"

টুকুন বলে, "তার চেয়ে চল, ক্যারাম খেলা যাক।" বোর্ডটা পেতে নিয়ে দুজনে খেলতে বসে।

খেলাটা যখন জমে ওঠে তখন মা এসে বলেন, "টুকুন, এখন হোমটাস্কগুলো তো করে রাখতে পারতে—রাত্তিরে ঘুম এসে যায়। এই গেমটা খেলেই খেলা শেষ করো। সলটু, তুমি বিকেলে টুকুনের সঙ্গে মাঠে খেলতে যেও, কেমন? ও এখন একটু পড়ালেখা করে রাখুক। ও তো সন্ধের পরই ঢুলতে থাকে।"

সলটু মুখটা শুকনো করে কোনোরকমে বলে, "আচ্ছা, মাসিমা।" তারপর গেমটা শেষ করেই উঠে চলে যায়। টুকুন ফিসফিস করে বলে, "রোজ-রোজ হোমটাস্ক—হ্যাঁ রে সলটু, কয়েকদিন যদি একটু জ্বর হয়— তাহলে তো বেশ মজা হয়। আর হোমটাস্ক করতে হয় না। খুব ক্যারাম আর লুডো খেলা যায় তোর সঙ্গে।" সলটু কিছু না বলেই চলে যায়।

সেদিন স্কুলেই কী রকম যেন মাথাটা ব্যথা ব্যথা করছিল টুকুনের। ক্লাসটীচার টুকুনকে মাথা নামিয়ে বসে থাকতে দেখেই কাছে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে—শরীর খারাপ?"

কপালে হাত দিয়ে বললেন, "গা তো বেশ গরম লাগছে। যাও, সিক রুমে গিয়ে শুয়ে থাক। আর-এক পিরিয়ড পরেই তো ছুটি হয়ে যাবে।"

The economy set with luxury features

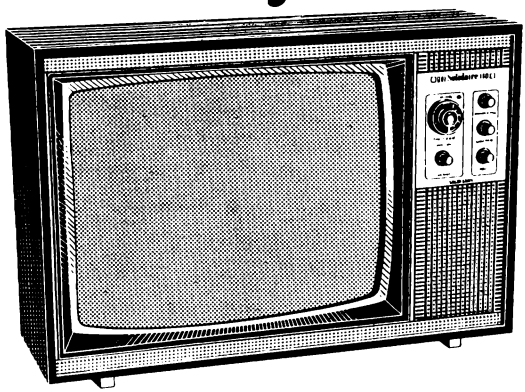

Solidaire
TS 32

Features include :

● Pick-up connections—unique for an economy set ● Tone control ● L.E.D. indicator ● V.I.F. circuit for picture clarity

Our exclusive range, enriched by V.I.F. circuit for picture clarity, includes :

- TS 52 : Hi-fi double speakers with separate bass & treble controls and double sliding shutters.
- TS 62 : The only TV with 10 watt amplifier and 8" dual cone speaker for real hi-fi sound, with sliding shutters.
- TAS 101 : The only stereo TV with 60 watt stereo amplifier and 2 x 50 litre speakers.

MANUFACTURED BY
HI-BEAM ELECTRONICS PVT. LTD. MADRAS-600 020

U-HIB-7

বাসে করে ঝিমোতে ঝিমোতে বাড়ি ফিরল টুকুন। মা বললেন, "বাথরুমে জামা-কাপড় রাখা আছে। যাও, ইস্কুলের ইউনিফর্ম ছেড়ে এসো। ভাত বাড়ছি।"

টুকুনের তখন খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। টুকুনকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা বললেন, "কী হল, দাঁড়িয়ে রইলে যে?" তারপর কী সন্দেহ হওয়াতে কাছে এগিয়ে এসে কপালে হাত দিয়ে বললেন, "এ কী, তোর তো বেশ জ্বর হয়েছে দেখছি। আমি জামা-কাপড় ছাড়িয়ে হাত-মুখ মুছিয়ে দিচ্ছি—তোকে কিছু করতে হবে না।"

মা চিন্তিত মুখে টুকুনের জামা-কাপড় ছাড়িয়ে হাত মুখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, "কী মুশকিল, জ্বর যে কেন হল!"

রোজ মা টুকুনের সঙ্গে খেতে বসেন। খেতে খেতে টুকুন হাত-মুখ নেড়ে-নেড়ে গল্প করতে থাকে মায়ের সঙ্গে—জানো মা, আজ ইস্কুলে কী হল। অমুক স্যার কী বললেন, তমুক ছেলে কী করল—এই সব।

মা মাঝে মাঝে বলেন, "আচ্ছা, সব শুনব পরে—এখন ভাতটা খা তো দেখি।" আজ আর সে-সব কিছুই হল না। মা খুব মনমরা হয়ে একা-একাই খেতে বসলেন। টুকুন ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। গা-হাত-মাথা সব ব্যথা করছে, গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

একটু পরেই কলিং বেল বেজে উঠল। সলটু এল সাপ-লুডোর ছক নিয়ে। মা খেয়ে উঠে কী একটা ওষুধের বড়ি খাইয়ে দিলেন টুকুনকে। জোর করে একটু গরম দুধও খাওয়ালেন। তারপর নরম গলায় বললেন, "হ্যাঁ রে, সলটুর সঙ্গে একটু লুডো খেলবি? আজ আর হোমটাস্ক করতে হবে না।" টুকুন তখন ছটফট করছে গা-হাত-পা ব্যথায়। বলল, "না মা, সলটুকে বলে দাও আজ আর খেলব না।"

সলটু চলে যেতেই মাথার ব্যথায় কষ্ট পেতে পেতে টুকুনের মনে হল, এতদিন সে চাইত একটু জ্বর হোক, তাহলে আর হোমটাস্ক করতে হবে না। সলটুর সঙ্গে যত খুশি লুডো আর ক্যারাম খেলতে পারবে, কিন্তু কই, এখন তো আর খেলতে ইচ্ছে করছে না। মা খেলতে বলা সত্ত্বেও সে খেলতে পারল না। তাহলে কি জ্বর হওয়াটা তেমন ভাল নয়?

বিকেলবেলা মাঠে ফুটবল খেলতে যাওয়াও হল না। ছোট্টু, রাজু, কিটুনরা এসে একবার খোঁজ নিয়ে গেল। টুকুন চোখ বুজে শুয়ে রইল—ওদের সঙ্গে কথাও বলতে ইচ্ছে করল না। বাবা অফিস থেকে ফিরে এসেই ডাক্তারখানা থেকে তেতো ওষুধ নিয়ে এলেন।

ভোরবেলা অ্যালার্ম বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেল টুকুনের। রাত্তিরেই ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেছে। মা উঠে পড়েছেন। রোজ টুকুন আবার ঘুমিয়ে পড়ে আর কত রকম স্বপ্ন দেখে—কিন্তু, আজ আর কিছুতেই ঘুম আসছে না। ঢং-ঢং করে ছটা বেজে গেল। মা বললেন, "টুকুন, আজ আর তুমি উঠো না। শুয়ে থাকো। ইস্কুলে যেতে হবে না।"

কই, টুকুনের যে মনে হত একটু জ্বরটর হলে বেশ হয়—ঘুমোতে পারা যাবে—কই, আজ তো আর ঘুম আসছে না। টুকুনের আবার মনে হল তাহলে কি জ্বর আসাটা সত্যি ভাল নয়?

সারাদিন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে রইল টুকুন। মাঝে-মাঝে মনে হতে লাগল, স্কুলে কী মজাটাই না হয় এই সময়ে। পড়ার ফাঁকে-ফাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে খেলা, গল্প, টিফিনে হৈ-চৈ—বাসে করে মজা করতে করতে যাওয়া-আসা। সলটুও আজ আর দুপুরে খেলতে এল না। রাজুরাও বিকেলে খোঁজ করল না। বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলেন। টুকুনকে আবার তেতো ওষুধ গিলতে হল। সময় যেন আর কাটতে চায় না। টুকুনের আবার মনে হল—তাহলে কি জ্বর আসাটা সত্যি-সত্যি ভাল নয়। ও যে মনে করত জ্বর হলে খুব মজা, হোমটাস্ক করতে হবে না, সলটুর সঙ্গে খেলতে পারবে, বেলা অবধি ঘুমোতে পারবে। কই, কিছুই তো হল না?

পরদিন ভোরে কিরিরিং-কিরিরিং করে অ্যালার্ম বেজে উঠতেই লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল টুকুন। মা বললেন, "এ কী, এখন যে সবে পাঁচটা বেজেছে। শুয়ে পড়ো। শরীর এখনও দুর্বল আছে। আজ আর ইস্কুলে যেতে হবে না।" টুকুন কিন্তু আর কোনো কথা শুনল না। বিছানা থেকে উঠে পড়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "না মা জ্বর খুব খারাপ। আমার জ্বর সেরে গেছে। আমি ইস্কুলে যাব, যাব, যাব।"

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

রেক্সোনা আপনার ত্বকের যত্ন নেয়...

ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল!

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ—
কেড, ক্যাসিয়া (দারুচিনি বিশেষ), লবঙ্গ আর টেরিবিন্থ। রেক্সোনা মেখে স্নান করুন— এ আপনার ত্বক রাখে কোমল ও উজ্জ্বল। অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রাখে আপনার প্রিয় সুরভি...আপনার ত্বকের যত্ন নেবার স্বাভাবিক উপায়!

রেক্সোনা আপনার ত্বকের পক্ষে ভালো

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-RX.78-1812 BG

রক্তের টান

বাণীব্রত চক্রবর্তী

অনেকদিন বাদে পার্থ আর আমি একসঙ্গে মুখোমুখি বসে মন খুলে আড্ডা দিলাম। মির্জাপুর স্ট্রীটের সেই পুরনো চায়ের দোকান। পাথরের টেবিল, বিবর্ণ দেওয়াল আর সামনে ঘিঞ্জি রাস্তা। একটা নামজাদা ওষুধের কোম্পানিতে বেশ একটা ভারিক্কি পদে চাকরি করতে করতে পার্থর চুল পেকে গেছে, মোটা হয়েছে। কিন্তু এখন আমরা দুজন কবেকার সেই ছেলেবেলার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতনই গল্প করছি। পাঁচরকম কথাবার্তা হতে হতে পার্থ হঠাৎ বলল, "দ্যাখ তিনু, তুই তো গল্প লিখিস। তোকে একটা অদ্ভুত ঘটনার কথা বলতে পারি। যদি তেমন করে সেটা লিখতে পারিস তবে কিন্তু গল্পটা পড়ে লোকে চমকে উঠবে।" বললাম, "আগে বল তো শুনি। তারপর ভেবে দেখব সেটা সত্যিই লেখার যোগ্য কি না।" আমার কথা শুনে পার্থ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল, "বছর দেড়-দুই আগেকার ব্যাপার। আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া অন্য কোনো দ্বিতীয় লোক ব্যাপারটা জানে না। তোকে বলছি, শোন।"

গল্পটা লেখার আগে বলে নেওয়া ভাল ঘটনাটা শুনে সেদিন আমি চমকে উঠেছিলুম। পার্থর মতন আমিও এই ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি।

পার্থ গল্পটা শুরু করেছিল এই ভাবে:

সেদিন অফিসের কাজকর্ম সেরে যখন ফ্ল্যাটে ফিরলাম তখন সন্ধে প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। দোতলায় আমার ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দরজা খোলা, কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে না। এটা কেমন হল! কেয়ারটেকার ছকুলালের কাছ থেকে ডুপ্লিকেট চাবিটি নিয়ে বিকেল-বিকেল ঘরের কাজ সেরে ভগীরথ চলে যায়। আর এখন যদি ভগীরথ থেকেও থাকে তবে অন্ধকার কেন? দরজাটা আস্তে আস্তে খুললাম। বলা যায় না, চোর-ডাকাত বা বদমাশ লোক যদি ঘাপটি মেরে থাকে। অন্ধকার। বাইরের রাস্তা থেকে যা সামান্য আলো এসে প্যাসেজে পড়েছে তাতেই দেখতে পাচ্ছি একটা ট্রাংক, হোল্ডঅল আর জলের পাত্র। এগুলো আমার চেনা। কলকাতার বাড়ির। এ-সময় কলকাতা থেকে কে এল? একমাত্র আমার ছোট ভাই দিপুর পক্ষেই আসা সম্ভব। কিন্তু বাবার শরীরের যা অবস্থা, তাঁকে একা রেখে দিপু কি এখন এই সুদূর দিল্লিতে চলে আসবে? প্যাসেজ পেরিয়ে অন্ধকার ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখি সোফায় কেউ-একজন বসে আছেন। 'কে?' বলে ডাক দিতেই উপবিষ্ট ভদ্রলোক আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে, পার্থ?"

চমকে উঠে বললাম, "বাবা, আপনি?" বাবা মাথা নাড়লেন। বাবাকে পরপর অনেকগুলি প্রশ্ন করলাম, "কখন এলেন? কার সঙ্গে এলেন? শরীর ভাল আছে তো? আলো জ্বালাননি কেন?"

বাবা হাত তুলে প্রথমেই বললেন, "আলো জ্বেলো না পার্থ। আলোটা একদম সহ্য করতে পারি না। আমার চোখের ব্যাপার তো জানোই। হ্যাঁ, একাই এসেছি। কালকা মেল একদম রাইট টাইমে এসেছে। কেয়ারটেকার লোকটি ভাল। ওই ঘর খুলে দিয়েছে।"

অনেকদিন পর বাবাকে দেখছি। অন্ধকারের মধ্যেও বুঝতে পারছি বাবা খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। ব্লাড-শুগার অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যাওয়াতে ওঁর চোখের ছানি অপারেশন করা যাচ্ছে না। একটু দূরে একটা চেয়ারে বসে বললাম, "এভাবে আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়া ওদের উচিত হয়নি। সে-রকম দরকার থাকলে দিপু তো আসতে পারত?"

বাবা বললেন, "আমার জন্য চিন্তা কোরো না। অনেকদিন কলকাতায় আসোনি। তোমার হয়তো আমাদের কথা মনে পড়ে না। কিন্তু আমাদের তো তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।"

বুঝলাম আমার কথায় বাবা কষ্ট পেয়েছেন। কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। বরং এক্ষুনি বাবার খাওয়াদাওয়া আর বিশ্রামের ব্যবস্থা করা দরকার। আমার চাঞ্চল্য লক্ষ করে বাবা বললেন, "তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। এই বেশ আছি। একটু চুপচাপ বসে থাকতে দাও। বরং তুমি অফিস থেকে ফিরছ, মুখ হাত পা ধুয়ে জামাটামা বদলে নাও। ঘরে তো নয়ই, বরং প্যাসেজের আলোটা যদি না জ্বালা হয় তাহলে ভাল হয়।"

পাতালে পাঁচ ঘণ্টা

২৩ বৈশাখ সংখ্যায় 'পাতালে পাঁচ ঘণ্টা' রচনায় শ্রীসুদেব রায়চৌধুরী চিনাকুড়ি কয়লাখনির দুর্ঘটনা সম্পর্কে লিখেছেন, "খাদে বা খনিগর্ভে এক বিস্ফোরণের দরুন প্লাবিত হয় খনিটি।" আসলে গ্যাস-বিস্ফোরণ-জনিত সেই দুর্ঘটনায় পুরো খনিটি বিষাক্ত গ্যাসে পরিপূর্ণ হয়েছিল— প্লাবন বা জলপ্লাবন ঘটেনি। বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্বন্ধে সুদেববাবু লিখেছেন, গভীর খাদে যদি "মিনিট পনেরোর বেশি সময় লোডশেডিং থাকে তাহলে মুহূর্তের মধ্যে খাদ জলমগ্ন হবে।" 'মুহূর্তের মধ্যে' নয়, পুরো খনিটি জলমগ্ন হতে কয়েকদিন লেগে যাবে। বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ হলে চিনাকুড়ির মতো খনির পক্ষে আসল বিপদ হচ্ছে গ্যাস বিস্ফোরণ। বিদ্যুৎচালিত ভেনটিলেশন পাখাগুলি বন্ধ হয়ে গেলে খনির বাতাসে বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ বিপদ-সীমা অতিক্রম করে এবং বিস্ফোরণের আশঙ্কা থাকে। তাই পনেরো মিনিটের বেশি বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ থাকলে খনিগর্ভের সমস্ত মানুষকে উপরে তুলে আনার নিয়ম।

—বিনয়ভূষণ পাল, ইস্ট কাতরাস কোলিয়ারি, কাতরাসগড়, ধানবাদ।

বাবার কথাই রাখলাম। আমার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে ঢুকে স্নান করলাম। দুরন্ত গ্রীষ্মে এই দিল্লিটা এখন সাহারা। স্নান করতে করতেই ভাবছিলাম অনেকদিন কলকাতায় যাওয়া হয়নি। সত্যিই সময় পাই না, কাজের খুব চাপ। ওষুধের কোম্পানির দায়িত্ব কি কম? বাবার অভিমান হয়েছে। বুড়ো হয়েছেন। আর ক'দিনই বা আছেন। মা বলেন, 'বাবা-মা যে কী জিনিস এখন বুঝছিস না। পরে বুঝবি।' ছোটবেলা থেকেই আমরা বাবাকে আপনি-আজ্ঞে করি। তা বলে তো আর বাবা দূরের নন। বাথরুম থেকে ফিরে অবাক হয়ে যাই। কোথায় বাবা? ঘর খালি। চাপা নিচু গলায় ডাকি,"বাবা, বাবা।" কোনো সাড়া নেই। প্যাসেজও ফাঁকা। ট্রাংক, হোল্ডঅল, জলের পাত্র কিছুই নেই। খোলা দরজা। দরজা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নীচে নেমে যাই। নেমেই একেবারে ছকুলালের মুখোমুখি। জিজ্ঞেস করি, "উনি কোথায় গেলেন?"

ছকুলাল অবাক। "কার কথা জিজ্ঞেস করছেন?"

বললাম, "আরে সন্ধেবেলায় যে ভদ্রলোককে তুমি আমার ঘর খুলে দিয়েছিলে। আমার বাবার কথাই জিজ্ঞেস করছি।"

ছকুলাল 'হায় রাম' বলে একটা লাফ দিয়ে বলল, "কী যা-তা বলছেন। আপনার ঘর তো আমি কাউকে খুলে দিইনি। বিকেলবেলায় ভগীরথ যেমন কাজ করে দিয়ে আমাকে চাবি দিয়ে যায় তেমন দিয়ে গেছে।"

আমার অবসর নেই। কাজ আর কাজ যেন পাঁচিল দিয়ে আমাকে ঘিরে রেখেছে। এতটুকু ফাঁক নেই। তবু দুদিনের ছুটি নিয়ে উড়ে চললাম কলকাতায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতা। দমদম থেকে মানিকতলাটা যেন হাজার মাইল দূরে। গলির মোড়ে ট্যাক্সি ছেড়ে দিলাম। সঙ্গে লাগেজ বলতে একটা স্যুটকেস। বুক আমার কাঁপছিল। বাড়িতে গিয়ে কী দেখব জানি। দেখব বাবা নেই। কিন্তু বাড়িতে পা দিয়েই বুঝলাম যা ভেবেছি ঠিক তার উল্টো। বাড়িতে যেন একটা হইহই পড়ে গেল। অনেকদিন পর আমাকে দেখে মা আমাকে জড়িয়ে ধরে হুহু করে কেঁদে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "বাবা কোথায়? বাবা কেমন আছেন?"

মা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, "উনি ওপরের ঘরে কাগজ পড়ছেন। ঠাকুরের কৃপায় এখন অনেকটা ভাল।"

ওপরের ঘরে বাবা ডেক চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছিলেন। আমি ওঁকে প্রণাম করলাম। উনি বললেন, "এসেছ ভালই হয়েছে। তোমাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছিল।"

আমার মনে তখন কী যে তোলপাড় চলছিল তা বলে বোঝানো যাবে না।

সেদিন মাঝরাতে বাথরুমে যেতে গিয়ে বাবা পড়ে গেলেন। দিপু ছুটল ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তার দত্ত যখন এলেন তখন সব শেষ। বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন।

পার্থ এইখানেই গল্পটা শেষ করেছিল।

ছবি অনুপ রায়

***

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল গেছেন লণ্ডন শহরে বেড়াতে। শহরের খুঁটিনাটি জানেন এমন একজন ইংরেজ পণ্ডিত তাঁর গাইড হয়েছেন। গাইডমশাই যে-জায়গাই দেখান, কোনো-না-কোনো বইতে ব্রজেন্দ্রনাথ সে-জায়গার কথা অনেক পড়েছেন। আসল মজাটা হল টাওয়ার অব লণ্ডনে এসে। একই সঙ্গে দুর্গ, প্রাসাদ আর বন্দীশালা এই টাওয়ারের প্রতিটি ঘর ও অলিন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নানা ঐতিহাসিক কাহিনী। গাইড এক-একটি ঘরের নাম করেন আর ব্রজেন্দ্রনাথ রাশি-রাশি কাহিনী ও তথ্যের ফুলঝুরি ছোটাতে থাকেন। সব দেখা হলে গাইডমশাই ব্রজেন্দ্রনাথকে বললেন, 'এবার থেকে আপনিই স্যার গাইড হোন, আপনার থেকে ভাল গাইড লণ্ডন শহরে নেই।'

আগের কথা : শিশিরের অসুখটা অদ্ভুত। চোখের সামনে নানা আজগুবি ব্যাপার ঘটে। অচেনা লোক বলে, কাছে যা আছে, তা না-রাখাই ভাল। সেটা কি এই পুরনো আঙটি? বাবুদা তাকে কৃষ্ণদয়ালের কাছে নিয়ে যায়। তিনি নানা অভিশপ্ত বস্তুর কথা শোনান। প্রয়াগ নামে যে-লোকটি শিশিরদের বাড়িতে কাজ করত, তার আসল পরিচয় কী? ভুয়ো টেলিগ্রামে পিসিমার অসুখের খবর পেয়ে শিশির হাজারিবাগে আসে। সাইকেল-চালক কি শিশিরকে মারবার চেষ্টা করেছিল? রহস্যময় মানুষ সিংহিবাবুর সঙ্গে শিশিরের দেখা হয়েছে। তারপর...

॥ ১৬ ॥

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পরই শিশির ঠিক করে নিল, সিংহিবাবুকে সে এড়িয়ে যাবে না। ভদ্রলোক ভাল মন্দ যেমনই হন, অন্যায় করেছেন। বাড়ি বয়ে এসে শিশিরকে ধমকে গিয়েছেন। হ্যাঁ, ওভাবে কথাবার্তা বললে অন্য আর কী ভাবা যেতে পারে! থানায় যাবেন বলে শাসালেন। কেন, থানায় যাবার মতন কী ঘটেছে? আর তুমি যদি থানায় যাও, আমিই বা কেন পারব না? অবশ্য এটা ঠিক, শিশিরের থানায় যাবার সঙ্গে সিংহিবাবুর কোনো সম্পর্ক নেই। মানে, থানায় গিয়ে সে যদি ডায়েরি লেখায়—সিংহিবাবুকে কোনোভাবেই জড়ানো যাবে না। কিন্তু সিংহিবাবু যদি সত্যিই থানার খাতায় ডায়েরি লেখান, শিশির আর বংশীকে জড়িয়ে ফেলতে পারেন।

একটা ব্যাপার দেখে শিশিরের কেমন অবাক লাগছে। কাল যখন সিংহিবাবুর ধমকানি সামলাতে শিশিরও পালটা থানায় যাবার কথা বলল, ভদ্রলোক কেমন গলা নামিয়ে নিলেন। কেন? আর ঠিক কী কারণে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে শিশিরকে ওঁর বাড়ি যাবার জন্যে বলে গেলেন? এখানেই ধোঁকা লাগছে।

শিশির আজ তিনটে কাজই সারবে। এক, সে সিংহিবাবুর বাড়ি যাবে সকালেই। দুই, বংশীর সঙ্গে থানায় যাবে। তিন, বাবুদাকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে এখানে চলে আসতে বলবে। বিকেলের পর একা-একা ঘোরাফেরা করা শিশিরের আর উচিত নয়।

সকালে চা-জলখাবার খাবার সময় পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলল শিশির।

"ভদ্রলোক যেন কেমন!" শিশির বলল।

শশধর বললেন, "আমার সঙ্গে আলাপ ছিল না। রাস্তাঘাটে দেখেছি। শুনেছি, ফটকের কাছে থাকেন। পাগলা ধরনের।"

"বাইরে পাগলা!"

"কেন!"

শিশির কোনো জবাব দিল না।

শশধর বললেন, "উনি এসেছিলেন কেন?"

এবারেও শিশির ঠিকমতন জবাব খুঁজে পেল না। বলল, "আমরা ওঁর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে দেখা পাইনি, তাই।"

"তুমি কেন গিয়েছিলে দেখা করতে?" শশধর জিজ্ঞেস করলেন।

"এমনি।" শিশির কথা ভাঙল না। উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে।

সিংহিবাবুর বাড়ি ঢুকতেই শিশির ভদ্রলোককে দেখতে পেল। বাইরে বেতের মোড়া নিয়ে বসে আসেন।

ভয় নয়, কেমন এক অস্বস্তি নিয়ে এগিয়ে গেল শিশির।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে শিশির কিছু বলতে যাচ্ছিল, প্রসন্ন বললেন, "এসেছ? এসো।"

অভ্যর্থনা দেখে শিশিরের মনে হল, মনে-মনে সিংহিমশাই যেন জানতেন, শিশির আসবে।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই শিশির বলল, "ডেকেছিলেন কেন?"

"ডেকেছিলাম! কই, আমি ডাকিনি।"

শিশির অবাক। মাথা গরম হয়ে উঠল। "আপনি আসতে বলেননি?"

"বলেছিলাম দরকার থাকলে সকালে আসতে পারো।"

মুখ লাল হয়ে উঠল শিশিরের। আচ্ছা মানুষ তো! রাগের মাথায় শিশির বলল, "আপনার সঙ্গে আমার কী দরকার!"

"দরকার যদি না থাকে তবে কাল সন্ধেবেলায় চোরের মতন এসেছিলে কেন?"

শিশির বুঝতে পারছিল, মানুষটি প্যাঁচোয়া। মচকাবার লোক নন। সে যে কী করবে বুঝতে পারল না। সামান্য পরে বলল, "চোরের মতন আসিনি। আপনি ভুল বুঝছেন। কাল সকালেও আমি এসেছিলাম। কাউকে দেখতে পাইনি। বিকেলেও কাউকে দেখতে না পেয়ে..."

"বুঝেছি। আর বলতে হবে না।...তা তুমি যখন সকাল-বিকেল আমার বাড়িতে এসে ধরনা মারছ, তখন বাপু দরকারটা তো তোমার! তাই না?"

কথাটা ঠিকই। তবু রাগ পড়ল না শিশিরের। বলল, "দরকার আর নেই। একজনের খোঁজ করছিলাম বলে এসেছিলাম। দরকার ফুরিয়েছে।" বলে শিশির রাগের মাথায় চলেই আসছিল।"

প্রসন্নবাবু ডাকলেন, "আরে আরে, রাগ করছ কেন! শোনো।"

ঘুরে দাঁড়াল শিশির।

"তোমরা—কলকাতার ছেলেছোকরারা বড় বদমেজাজি হও," প্রসন্ন বললেন, "রাগের কথা আমি কিছু বলিনি। বলেছি? এসো, ভেতরে এসো। রোদে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ কথা বলবে!"

শিশিরের রাগ না পড়লেও সিংহিবাবুর কথাবার্তার ধরন অন্য রকম লাগল কানে। তামাশা করছেন নাকি?

"চলো, ভেতরে গিয়ে বসি।" প্রসন্নবাবু আবার বললেন, মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ইতস্তত করল শিশির। তারপর বারান্দায় উঠল।

কালকের সেই ঘর। কাল ঘরের ভেতর দিকের দরজা ও-পাশ দিয়ে বন্ধ ছিল। আজ খোলা রয়েছে।

প্রসন্ন ঘরের ভেতর দিয়ে পেছনের বারান্দায় এলেন। একটা বেঞ্চি পাতা রয়েছে একপাশে। ক্যাম্বিসের হেলানো চেয়ারও চোখে পড়ল। ভেতরের দিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। অল্প-কিছু গাছপালা। ছায়া। ছোট কুয়ো। দেহাতি এক বুড়ো কাজকর্ম করছিল।

"বোসো।" বসতে বললেন প্রসন্ন।

শিশির বসল। বসে বলল, "বাইরে থেকে মনে হয় এ-বাড়িতে কেউ থাকে না।"

প্রসন্ন বললেন, "বাইরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। ভেতরে থাকি। যাওয়া-আসাও বেশির ভাগ সময় ভেতর দিয়ে। ওই যে দেখছ...।"

শিশির দেখল। পেছনের পাঁচিলের দিকে ছোট একটা ফটক। মানুষটি সত্যিই অদ্ভুত। বাড়ির সামনের দিক জঙ্গল রেখে ভেতরের দিকে দিব্যি থাকেন।

"এবার বলো, তুমি আমার খোঁজে কেন এসেছিলে!" প্রসন্ন বললেন।

শিশির দু মুহূর্ত ভেবে বলল, "আমি একজনকে খুঁজতে এসেছিলাম।"

"সে কে?"

"তাকে আমি কলকাতায় দেখেছিলাম। নাম জানি না।"

"আমার সঙ্গে তার মিল আছে?"

"না, না। মিল নেই। তবে মুখে বর্ণনা শুনলে খানিকটা আপনার মতন মনে হয়। বংশী আমায় বলেছিল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কোনো মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে বলেনি।"

"বুঝেছি।"

শিশিরের রাগ পড়ে আসছিল। "আমরা কোনো মতলব নিয়ে আপনার বাড়িতে আসিনি। কিন্তু বাড়ির বাইরের চেহারা যা, তাতে অবাক হয়েছি। আর আপনার তালা আমরা ভাঙিনি। ওটা খোলাই ছিল।"

প্রসন্ন এমন চোখ করে তাকালেন যেন ব্যাপারটা তিনি ভুলেই গিয়েছেন। তিনি অন্য কিছু ভাবছিলেন।

শিশির ভাবছিল, এবার উঠে পড়বে কি না! কিন্তু ভদ্রলোককে একটু না-বাজিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

দু-জনেই সামান্য চুপচাপ। বাগানে কাক, চড়ুই ডাকাডাকি করছে। সামনের দিকে ফাঁকা মাঠ, ঢালু হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছে অনেকটা। বাঁ দিকে পুকুর। দূরে প্রান্তর। আরও দূরে বন-জঙ্গলের ঝোপ। চড়া রোদে মাঠঘাট টকটক করছিল।

সত্যজিৎ রায়ের

আলাদা স্বাদের উপন্যাস

ফটিকচাঁদ

চলচ্চিত্রে রূপায়িত হচ্ছে

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

সত্যজিৎ রায় ফেলুদা-সিরিজের উপন্যাসে অদ্বিতীয়, প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানার বর্ণনায় তুলনাহীন, এ যেমন সত্যি, তেমনই তাঁর 'ফটিকচাঁদ' উপন্যাসটি যে এক অসাধারণ কীর্তি এতেও কোনো সন্দেহ নেই। ছোট্ট একটি বছর বারোর ছেলে, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তার ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল। সারা দেহে তার জখমের চিহ্ন। জ্ঞান ফিরল এক সময়ে, কিন্তু স্মৃতি ফিরল না। নিজেই একটা নাম বানিয়ে নিল সে—ফটিকচাঁদ পাল। সেই স্মৃতিভ্রষ্ট ছেলেটির স্মৃতি হারানো এবং স্মৃতি ফিরে পাওয়ার এক দারুণ রোমাঞ্চকর কাহিনী 'ফটিকচাঁদ।' প্রচ্ছদ ও ইলাসট্রেশন—সত্যজিৎ রায়েরই।

নতুন বই

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের
পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক
দাম ১০·০০

প্রমদাচরণ সেনের
ভীমের কপাল
সম্পাদনা : সুনীল দাস
দাম ৭·০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের
রুকু সুকু
দাম ৮·০০

আরো অনেক বই

সত্যজিৎ রায়ের : বাদশাহী আংটি ৮·০০ এক ডজন গপ্পো ১২·০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৮·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৭·০০ সোনার কেল্লা ৬·০০ বাক্স রহস্য ৭·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৭·০০ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৭·০০ আরো একডজন ১২·০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০ ফটিকচাঁদ ১০·০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ১০·০০ মহাসংকটে শঙ্কু ৬·০০ গোরস্থানে সাবধান ৮·০০ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ৮·০০ হত্যাপুরী ৮·০০ **সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের :** ভয়ঙ্কর সুন্দর ৭·০০ সত্যি রাজপুত্র ৬·০০ তিন নম্বর চোখ ৬·০০ হলদে বাড়ির রহস্য ও দিনে ডাকাতি ৬·০০ সবুজ দ্বীপের রাজা ৮·০০ জঙ্গলের মধ্যে গম্বুজ ৮·০০ ডুংগা ৭·০০ পাহাড়চূড়ায় আতঙ্ক ১০·০০ **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের :** ঘণ্টাদার কাবুল কাকা ৬·০০ অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৭·০০ তপন চরিত ৬·০০ সমগ্র কিশোর সাহিত্য ১ম ২৫·০০ সমগ্র কিশোর সাহিত্য ২য় ২৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

প্রসন্ন নিজেই বললেন, "আমার মতন কাউকে তুমি খুঁজছ এখানে?"

শিশির মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ।"

"এখানে তেমন কেউ আছে?"

"খুঁজে দেখতে হবে।" শিশির সরাসরি কোনো জবাব দিল না।

"ছোট জায়গা। খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না।"

প্রসন্নর গলায় যেন চাপা কৌতুক ছিল।

শিশির হঠাৎ বলল, "আপনি এখানে নতুন। তাই না?"

"কেন?"

"আমি ক'মাস আগে যখন এখানে এসেছিলাম, আপনাকে দেখিনি।"

প্রসন্ন এবার হাসির মুখ করলেন। "চোখে পড়িনি তোমার।"

"ছিলেন আপনি?"

"ছিলাম।"

শিশির মনে-মনে হিসেব করল। বলল, "আমি বেশি দিন ছিলাম না। কলকাতায় ফিরে গিয়েছিলাম।...আপনিও তো কলকাতা যান?"

"যাই। ক'দিন আগেই গিয়েছিলাম।"

শিশির বুঝতে পারল, যেদিক দিয়েই ধরবার চেষ্টা করছে সে, সিংহিবাবু বেশ সহজেই পিছলে যাচ্ছেন। "কলকাতায় আপনার বাড়ি?"

"না।"

"কোথায় বাড়ি?"

"কাশী।"

"ও! বেনারসের লোক আপনি!"

প্রসন্ন এবার একটু হাসলেন। "তুমি যাকে খুঁজছ তার নাম কী?"

চোখে-চোখে তাকাল শিশির। "নাম জানি না।"

"নাম জান না? থাকে কোথায়?"

"তাও জানি না। এখানে থাকতে পারে।"

আবার চুপচাপ। শিশির ভাবছিল, এবার উঠে পড়া ভাল। ভদ্রলোককে কায়দা করা তার সাধ্য নয়। বংশীর সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

উঠে পড়ার ভঙ্গি করল শিশির। "আমি তা হলে উঠি!"

"উঠবে! চা খাবে না?"

"চা! না না, আমি এইমাত্র বাড়ি থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি।"

"বেশ। তা হলে এসো।"

শিশির উঠে দাঁড়াল।

প্রসন্ন আচমকা বললেন, "একটু দাঁড়াও।" বলে তিনি উঠলেন। উঠে ঘরে চলে গেলেন, বাঁ দিকের ঘরে। ভেতর দিকের ঘর, শিশির ভেতর দিকের ঘরদোর আগে কিছু দেখেনি। আজ বাড়ির ভেতর দিকটা দেখছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল শিশিরকে।

প্রসন্ন ফিরে এলেন। হাতে একটা ছবি। ফটোগ্রাফ।

"তুমি যাকে খুঁজছ, দেখো তো এই ছবিটা তার কি না?" প্রসন্ন একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফটো দিলেন।

শিশির ছবিটা নিয়ে দেখল। দেখেই চমকে উঠল। সিংহিমশাইয়ের মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। বলল, "হ্যাঁ, এই ভদ্রলোক। এঁর ছবি আপনি কোথায় পেলেন? চেনেন এঁকে?"

"না-চিনলে তোমায় ফটো দেখাব কেন," প্রসন্নর মুখে হাসি। যেন বিদ্রূপ করছেন।

শিশির বলল, "কোথায় থাকেন ইনি। কী নাম?"

"ইনি এখানে থাকেন না। নাম শুনে কোনো লাভ নেই।... তা ইনি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছেন?"

শিশির এমন অদ্ভুত মানুষ জীবনে দেখেনি। সিংহিমশাইকে বড় বেশি রহস্যময় মনে হচ্ছিল।

"না, আমার কোনো ক্ষতি উনি করেননি। বরং আমার উপকার করতে চেয়েছিলেন। আমি ওঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছি।"

"জানি।"

"জানেন?"

মাথা হেলালেন প্রসন্ন। বললেন, "তুমি কে, কেন এখানে এসেছ, আমি জানি। তোমার অসুখের কথাও আমার জানা।"

শিশির নির্বাক। সিংহিমশাইকে দেখছিল। পলক পড়ছিল না চোখের।

অনেকক্ষণ পরে প্রসন্ন বললেন, "আমি তোমার শত্রু নই। তোমার শত্রুতা যারা করছে, তাদের আমি চিনি। তুমি চেনো না।" (ক্রমশ)

টারজান

এড্‌গার রাইস বারোজ

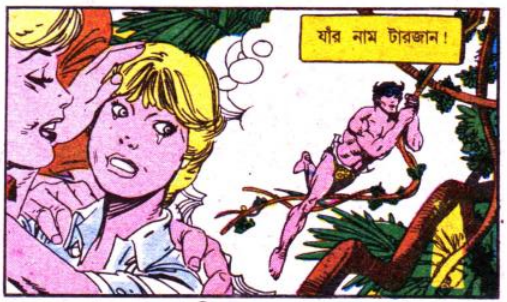

(আগামী সংখ্যা থেকে টারজানের নতুন অ্যাডভেঞ্চার)

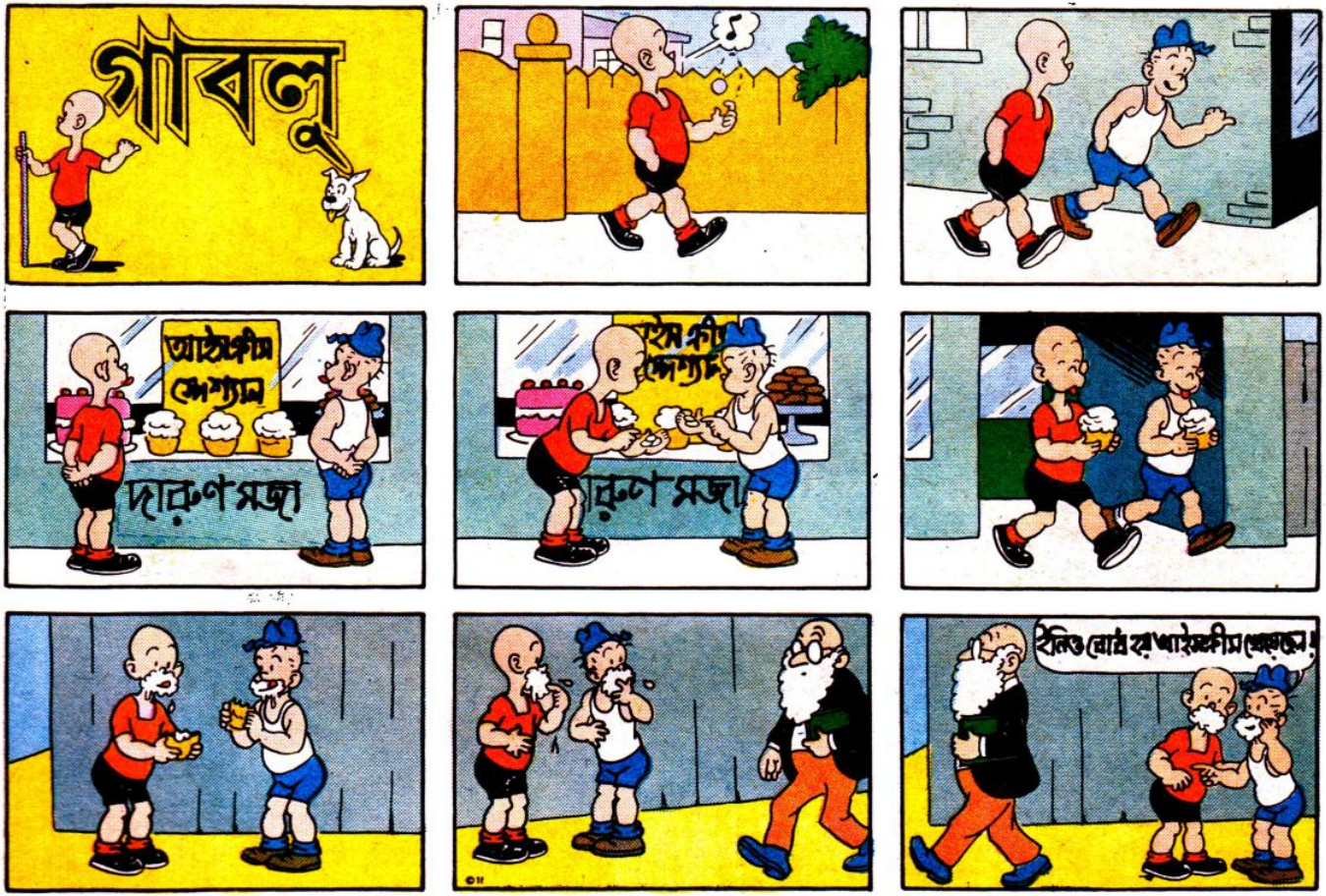

গাবলু
আইসক্রীম সেশ্যান
দারুণ মজা
দারুণ মজা
ইনিও বোধ হয় আইসক্রীম খেয়েছেন!

আওয়াজ-রহস্য

বাচস্পতি

"এই যে শ্বাস টানছি আমরা," হিগিনকাকু বুক ফুলিয়ে শুশুকের মতো দম নিলেন, "এটা ফুসফুসে যাচ্ছে জানিস তো? সেখানে হৃৎপিণ্ড রক্ত চালান করছে, আর এই নিশ্বাসের অক্সিজেন সে রক্ত সাফ করে দিচ্ছে।"

ভণ্টু বলল, "ওসব তো স্বাস্থ্য-বইয়ের কথা!"

"আহা শোন্ না!" হিগিনকাকু বলে উঠলেন, "রক্ত সাফ হয়ে গেল, এখন ঐ বাতাসটা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে ভর্তি, নোংরা জিনিস। শরীর এখন সেটাকে বার করে দেবে, আবার নতুন করে শ্বাস নেবে।"

ভণ্টু বলল, "ও কাকু, যে-বাতাসটা টেনে নিই সেটা কি নিশ্বাস? আর যেটাকে ছেড়ে দিই সেটা প্রশ্বাস?"

হিগিনকাকু চোখ জুলজুল করে জার্মান ভাষায় বললেন, "ৎসের গুট্—খুব ভাল! তবে কিনা ভণ্টুবাবু, তুমি একটু বেশি স্মার্ট হয়ে পড়লে। সংস্কৃতে কি বাংলায় কথা দুটো ওভাবে আলাদা করা নেই, দুটোতেই শ্বাস-টানা শ্বাস-ছাড়া দুই-ই বোঝাতে পারে।"

"হলে কিন্তু বেশ হত, তাই না?" ভণ্টু একটি 'নিশ্বাস' ছেড়ে বলল।

হিগিনকাকু এক বন্ধুর মুদ্রাদোষ নকল করে বললেন, "যাকগে যাকগে যাকগে যাক। আসল পয়েন্টে এসো। বাতিল নিশ্বাসের বাতাসকে শরীর ফুসফুস বার করে দেবে। কোন্ পথে বেরুবে এখন সেটা?"

ভণ্টু চটপট উত্তর দিল, "কেন কাকু, যে-পথ দিয়ে ঢুকেছিল, ঐ শ্বাসনালি দিয়ে?"

"উত্তম!" হিগিনকাকু খুশি হলেন খুব। "এখন ঐ যে শ্বাসনালি, ইংরেজিতে যার নাম ট্রেকিয়া (trachea), ওটা তো একটা নলের মতো—মুখ আর ফুসফুসকে জুড়ছে। তাই তো?"

ভণ্টু মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

"ঐ ট্রেকিয়ার ওপরের অংশটার নাম হল ল্যারিংস।" বলেই হিগিনকাকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, রোগা সিড়িঙ্গে লোকদের গলা লক্ষ করেছিস কি? কারো-কারো গলার ওপরদিকে একটা উঁচু ঢিবিমতন থাকে না, যেন চামচিকে গিলেছে, কিন্তু সেটা গলায় আটকে আছে এইরকম?"

ভণ্টু এবার একটু রাগ করল। নিজে মোটাসোটা বলে হিগিনকাকুর রোগা লোকদের সম্বন্ধে এসব খারাপ-খারাপ কথা বলা কি উচিত হচ্ছে? সে-কথা বলায় হিগিনকাকু থমকে গেলেন, তারপর স্প্যানিশ ভাষায় বললেন, "লো সিয়েন্তো! দুঃখিত! যা করেছি বিজ্ঞানের জন্যে, তোমাকে বোঝানোর জন্যে। আমার বাবাই তো ও-রকম ছিলেন ভণ্টু, তুমি তাঁকে দ্যাখোনি! যা হোক শোনো—"

ভণ্টু এবার হেসে বলল, "বুঝেছি জিনিসটা। ওটাকে ইংরিজিতে কার আপেল না কী যেন বলে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আদমের আপেল, অ্যাডামস অ্যাপ্‌ল। বাংলায় ঐ জায়গাটাই কণ্ঠা। শোন্, ঐ কণ্ঠার ভেতরে দু পাশে লাগানো দুটো পর্দা আছে, যে-দুটো গুটিয়ে নালির পথ পুরো খুলে দিতে পারে, আবার পর্দার মতো, বা দরজার পাল্লার মতো—দুদিক থেকে খুলে গিয়ে পথটা বন্ধ করে দিতে পারে। এ দুটোর নাম স্বরতন্ত্রী বা ভোকাল কর্ড। হারমোনিয়ামের রীড দেখেছিস?"

ভণ্টু বলল, "হ্যাঁ, পাশের ফ্ল্যাটের সুমিদিদির হারমোনিয়ামটা খুলেছিল একদিন। ভেতরে সার-সার পেতলের পাত বসানো, বলল ঐগুলোই রীড, বেলো করে বাতাস ঢোকালে ঐগুলোতেই নাকি আওয়াজ হয়। আমি তো আগে ভাবতাম ওপরের সাদা-কালো চাবিগুলোই বুঝি রীড!"

হিগিনকাকু হেসে বললেন, "না-না। এখন শোন্, আমাদের ঐ স্বরতন্ত্রী দুটো রীডের মতো। খানিকটা খুলে বাতাস দিয়ে ঠেলা দিলেই ও দুটো কাঁপবে, আর কাঁপলেই আওয়াজ হবে। শোন্, দুটো আঙুলে তোর কণ্ঠাটা জোরে চেপে ধরে বল্ 'আ'—"

ভণ্টু আওয়াজটা করতে-করতে দেখল কণ্ঠাটা রিনরিন করে কাঁপছে, বুঝল আসলে স্বরতন্ত্রী দুটো কাঁপছে।

হিগিনকাকু টেবিল চাপড়ে বললেন, "এই হল গলার আওয়াজের রহস্য!" (ক্রমশ)

ক্লাসে হাসাহাসি

প্রসাদ

চামেলিদের ক্লাসে কী নিয়ে যেন একটা চাপা হাসাহাসি চলছিল। পেছন দিকের বেঞ্চে তিন-চার জন মেয়ে কী একটা দেখাদেখি করছিল আর সামনের মেয়েদের আড়ালে মুখ ঢেকে হেসে-হেসে উঠছিল। কিন্তু ইতিহাসের দিদিমণির চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। ঠিক তাঁর নজরে পড়ে গেল।

Miss Rao: What are those girls over there laughing at? Suddenly there is complete silence. The girls who were laughing are now trying to look very grave.

Miss Rao: What's so funny? Well, Rupa, what have you got in your hand?

Rupa: It's a book, Miss Rao.

Miss Rao: I can see it's a book. What book? Tell us about it, will you? What's it called?

Rupa: It's called "Three Men in a Boat", Miss Rao.

Miss Rao: Really? I'm not surprised that you are laughing. But tell us what the book is about.

Rupa: It's about three men who go on a journey in a boat.

Miss Rao: Don't forget the dog. But what do you find so funny in the book?

Rupa: Everything, Miss Rao. Do you remember what happens when they are waiting for the boat to sail, and when it rains and when uncle Podger hangs a picture?

Miss Rao: I do, indeed. And what could be funnier than the quarrels? Do you read a lot of story-books, Rupa?

Rupa: Yes, Miss Rao, a lot.

Miss Rao: What do you read them for? Only for laughs?

Rupa: No, Miss Rao. I love to read stories of other kinds, too.

Miss Rao: What other kinds? What kind of stories do you like most?

Rupa: Oh, I don't know. All kinds. Funny stories, adventures, school-stories.

Miss Rao: Have you ever tried to write a story yourself?

Rupa: Yes, Miss Rao, I've written quite a few. But I haven't let anybody see them.

Miss Rao: Why not? What do you write them for, then? And whom do you write your stories for? You must try to get one published in the school magazine. What are stories good for unless people can read them?

Rupa: Yes, Miss Rao.

লক্ষ করো :—

What are the girls laughing at?
What is the book about?
What do you read stories for?
What are stories good for?

আরো দ্যাখো :—

What book is that?
What do you find so funny?
What other kinds of books do you read?

বাঘা

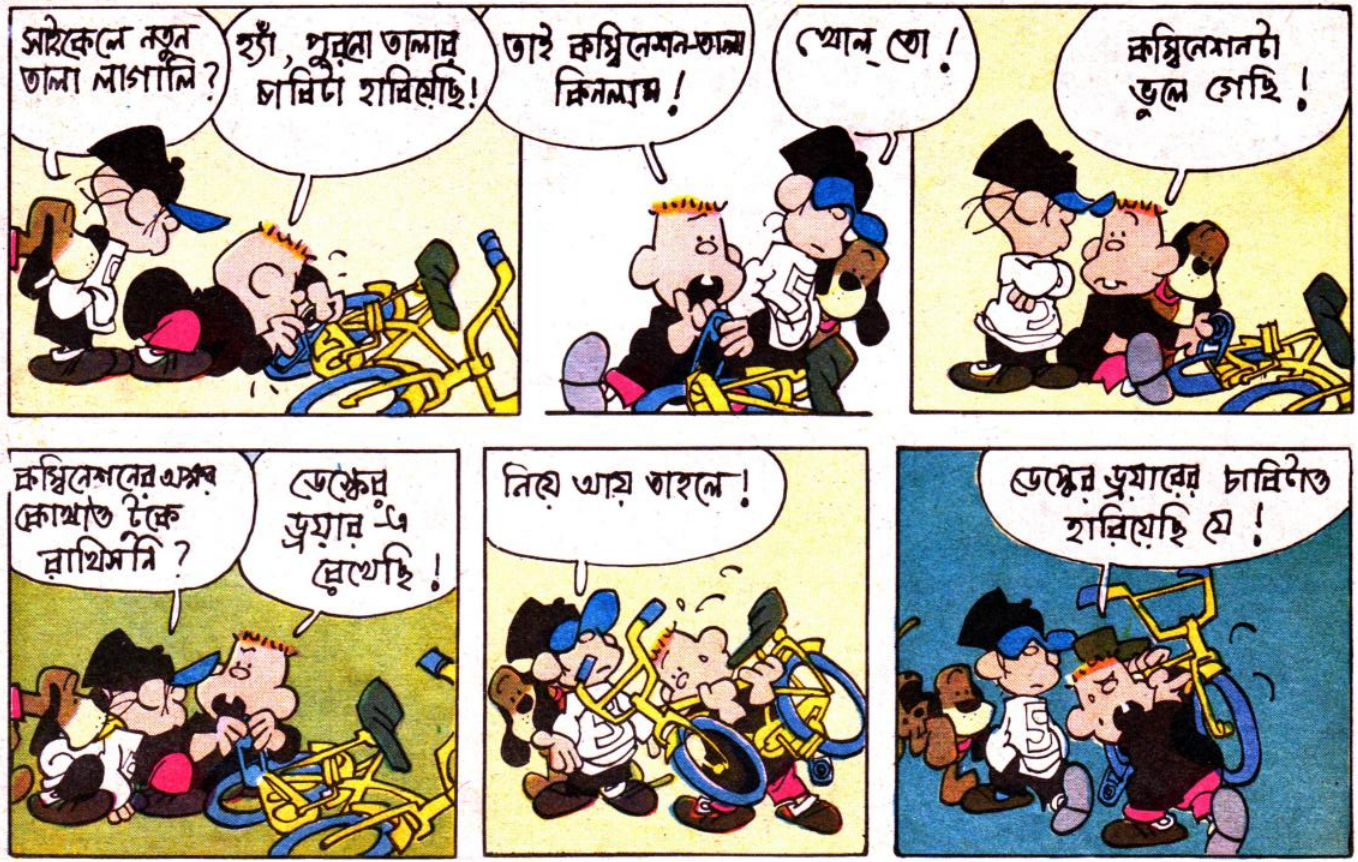
সাইকেলে নতুন তালা লাগালি?
হ্যাঁ, পুরনো তালার চাবিটা হারিয়েছি!
তাই কম্বিনেশন-তালা কিনলাম!
খোল্ তো!
কম্বিনেশনটা ভুলে গেছি!
কম্বিনেশনের এসব কোথাও টুকে রাখিসনি?
ডেস্কের ড্রয়ার-এ রেখেছি!
নিয়ে আয় তাহলে!
ডেস্কের ড্রয়ারের চাবিটাও হারিয়েছি যে!

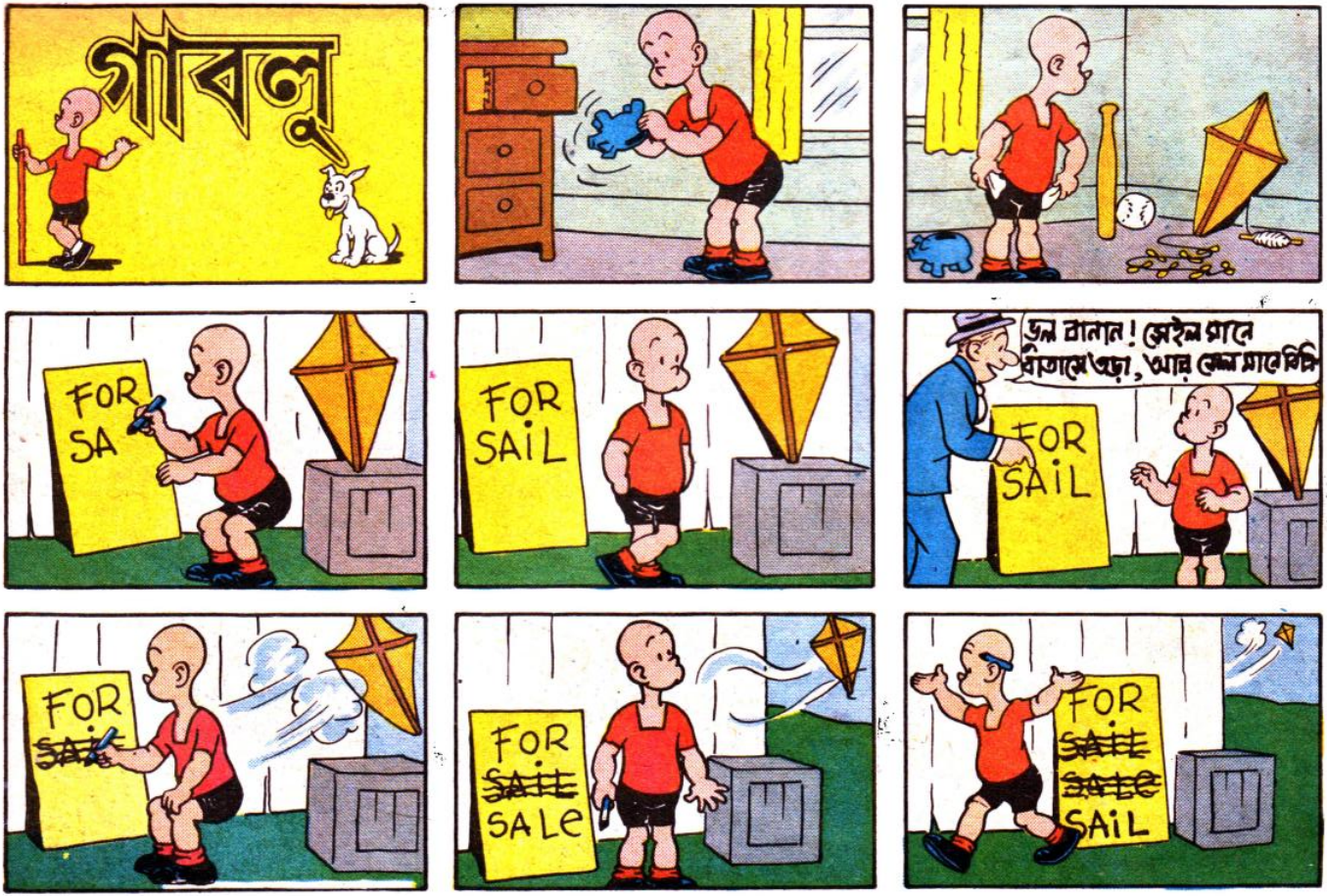

গাবলু
FOR
SA
FOR
SAIL
ভুল বানান! সেইল মানে বাতাসে ওড়া, আর সেল মানে বিক্রি
FOR
SAIL
FOR
SAIL
FOR
SAIL
SALE
FOR
SAIL
SALE
SAIL

ডিম থেকে পাখি

ডিমের বাইরের আকারের বিশেষ বদল না ঘটিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন ভঙ্গিতে কেমনভাবে পাখিকে ধরা হল তা লক্ষ করো। আমি তো মাত্র কয়েকটি পাখির নমুনা এঁকে-এঁকে তোমাদের পাখির আকার ধরার উপায় বলার চেষ্টা করছি। নিজেরা করতে-করতে দেখবে আমার চেয়েও বেশি দেখতে পাচ্ছ।

—রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্ডবোর্ডের কাজ : বাক্স—১

এই কাজের জন্যে হাতের কাছে রাখো নানান আকারের বোর্ড, আঠা, কাঁচি, ছুরি, রঙ, স্কেল, কম্পাস আর সুতো।

শুরু করো—তোমার ইচ্ছেমতো মাপের বাক্সের জন্য একটা চৌকো বোর্ড বেছে নিয়ে সেই মাপমতো কেটে নাও। এবার এই চৌকো কাগজে চারপাশে ১" বা ১ ১/২" মাপের একটা দাগ দিয়ে রাখো,(ক ছবি)। দাগ দেওয়ার পর দেখবে চার কোণে চারটে ছোট চৌকো তৈরি হয়েছে। তাকে নকশায় দেখানো নমুনার মতো কোনা রেখে বাদবাকি কালো অংশ সব বাদ দিয়ে নাও। এরপর মাঝের দেওয়া ফোঁটা-ফোঁটা দাগ-বরাবর ভাঁজ করলেই বাক্স পাবে। বাক্সের তেকোনা বাড়তি অংশগুলোকে একে অপরের সঙ্গে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেই শক্ত বাক্স তৈরি।

জেনে রাখো—(১) এ-কাজের দুটি প্রধান দিক—নিখুঁত মাপ ও সেইমতো পরিচ্ছন্নভাবে কাটা। (২) বোর্ড খুব পাতলা বা মোটা হবে না। (৩) ভাঁজ করার আগে ভাঁজের জন্য কাটা দাগের উলটো দিকে ছুরির ভোঁতা দিক দিয়ে চাপ দিয়ে নিলে ভাঁজ নিখুঁত হবে। (৪) বাক্সের গভীরতা নির্ভর করবে চৌকোর চারপাশে যতটা জায়গা ছাড়বে তার ওপর।

—কারিগর

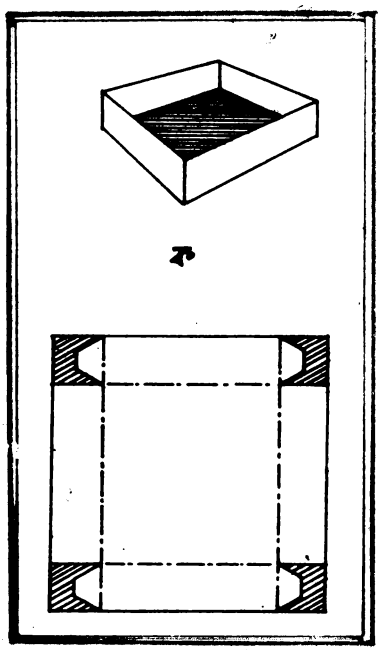

প্রকৃতির এক নতুন আবিষ্কার !

প্রকৃতির বিশেষ কোমল পদ্ধতিতে

আপনার রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লীতে একটি বিশেষ উপাদান আছে যা ত্বকের ভেতরে গিয়ে স্বাভাবিক, কোমল ও নিরাপদভাবে কাজ করে। এছাড়া, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী আপনার ত্বকের বাইরে রক্ষী হিসেবে, বিশেষ উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে তৈরী 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা' দিয়ে,আপনার ত্বককে রোদে পোড়ার হাত থেকে রক্ষা করে···

অথচ আপনার ত্বক সূর্য্যকিরণের সমস্ত স্বাস্থ্যকর গুণ শুষে নিতে পারে। ৬ সপ্তাহ ধরে প্রত্যহ মাখলে, ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী রঙ এমন ফর্সা করে, যা নজরে পড়ে !

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী– ফর্সা হবার কোমল উপায়

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

লিনটাস-FALOV.10-172 BG

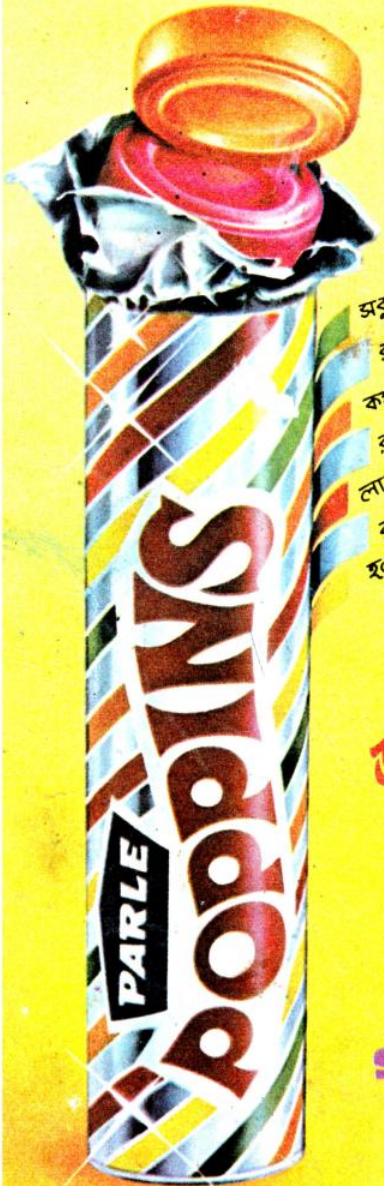

everest/81/PP/101-bn